ضياء القلوب

যিয়াউল ক্বুলুব

হৃদয়ের আলো

মুলঃ হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজের মক্কী (রঃ)

যিয়াউল কুলুব

(হৃদয়ের আলো)

চার তরীকার আমল

সায়্যিদুত্তায়িফা, শায়খুল মাশায়েখ, কুতবে আলম
হযরত মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ
মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
অনূদিত

মদিনা একাডেমী
৩১/৩২, পি.কে.রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৪২৩৮২৯১৩

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (রহঃ) মুবারক
স্মৃতির উদ্দেশ্য

প্রকাশক
জিয়াউর রহমান
রাজৈর, মাদাপরীপুর।

প্রথম প্রমাশ-১৯৭৮
পঞ্চম প্রকাশ-২০০৯
ষষ্ঠ প্রকাশ-২০১৩
৭ম প্রকাশ-২০১৫

সত্ত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

হাদিয়া : ১২০.০০ টাকা মাত্র

ভূমিকা

পশু প্রবৃত্তি দমন করিয়া আল্লাহর গুণাবলীতে নিজেকে সুশোভিত করিয়া তোলাতেই নিহিত মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। আত্মা ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে পরম প্রিয়তম বিশ্ব স্রষ্টার মাঝে আত্মলীন হওয়াতেই মানুষের চরম সফলতা। আর এই পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যেই মূলত ঃ প্রেরিত হইয়াছিলেন হাজারো লাখো আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম। আম্বিয়া, সিদ্দীকীণ, শুহাদা ও সালেহীন অনুসৃত এই পরিশুদ্ধ এবং অনন্ত অস্তিত্বে সাত্তালীন হওয়ার প্রশিক্ষণ পদ্দতিই সুলুক ও তাসাওউফ নামে পরিচিত। কুরআন ও হাদীসে ইহাকে তাযকিয়া ও ইহসান নামেও অভিহিত করা হইয়াছে।

সাহাবীগণের পর হযরত হাসান বসরী, আহমদ কবীর সিফায়ী, গাউসুল আজম হযরত আবদুল কাদির জিলানী, হযরত শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী, হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দী, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) প্রমুখ বুযুগানে দ্বীন ও আওলিয়ায়ে কিরাম এই পথেরই কতিপয় প্রোজ্জ্বল ও মহান ব্যক্তিত্ব। সায়্যিদুত্তায়িফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) এই সালেহীন ও মুজাহিদীনের সিলসিলারই সুমহান একটি নাম। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভীর চিন্তাধারা এবং বালাকোটের শহীদ হযরত সায়্যিদ আহমদ ও ইসমাইল শহীদের ছিলেন তিনি সাক্ষাত ফসল। রিয়াযত মুজাহদা ও ইলাহী প্রেমের আলোয় একদিকে যেমন তিনি করিয়া তুলিয়াছেন হাজারো বন্দেগানে খোদার আত্মা সুনির্মল ও সমুজ্জ্বল, তেমনি অপরদিকে ভারত উপমহাদেশ তথা ইংরেজ ও সাম্রাজ্যবাদী শাসিত মুসলিম জনপদসমূহের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে লিপ্ত হইয়াছিলেন বাতিলের বিরুদ্ধে চরম আহবে। তিনি ছিলেন হিপাসী বিপ্লবের সিপাহসালার। পরিনাশে মাতৃভূমি ভারত ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল পবিত্র মক্কা ধামে। সেই স্থান হইতেহৈ তিনি অমৃত্যু পরিচালনা করিয়া গিয়াছিলেন মুক্তিকামী মুসলিম জনতার আন্দোলন। দেওবন্দ মাদ্রাসা ছিল মূলতঃ তাঁার প্রেরণা ও হাজারো রাত্রির সেহেরগাহী ও রোনাজারীর ফল।

তাসাওউফের ক্ষেত্রে তাঁহার রচিত 'যিয়াউল ক্বুলুব' পুস্তিকাটি ছোট হইলেও মৌলিকতার দাবীদার। অতি সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে তিনি ইহাতে তাসাওউফের বিভিন্ন পদ্ধতির বিবরণ তলিয়া ধরার প্রয়াস পাইয়াছেন। বর্তমানে আমাদের বাজার তাসওউফের নামে ভিত্তিহীন ও শরীয়তের সীমার সহিত স্মপর্কহীন পুস্তক-পুস্তিকায় ছাইয়া যাওয়ায় ইহার সঠিক রূপটি বাংলা ভাষাভাসী ভাইদের খেদমতে পেশ করার উদ্দেশ্যে পুস্তকটি তরজমার এই প্রয়াস।

মেসার্স নূর লাইব্রেরী বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া এই দেশের বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভাইদের বিশেষ করিয়া আমাকে ঋণী করিয়া রাকিলেন। অনুজ প্রতীম মাওলানা মুতিউর রহমান এবং হাফেজ মুজীবুর রহমান ইহার কপি করার ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। হযরতুল উস্তায মাওঃ কাজী মুতাছিম বিল্লাহ, হযরত মওঃ আশরাফ আলী, বাবা জনাব মওলবী আবদুর রশীদ সাহেবত্রয় উৎসাহিত করিয়াছেন নানাভাবে। সকলের নিকটই অধম ঋণী।

পুস্তকটির তৃতীয় সংস্করণ যতাসম্ভব পরিমার্জিত আকারে প্রকাশিত হইল। এতদসত্ত্বেও কোন ভুল-ত্রুটি থাকিয়া গেলে তাহা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে অবগত করাইলে আগামীতে ইনশাল্লাহ শুদ্ধ করিয়া লওয়ার প্রায়স পাইব। আল্লাহ আমাদের মেহনত কবুল করুন, আমীন। সকলের সহযোগিতা কামনান্তে।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা	১৩
তাম্বীহ	১৩
প্রথম তরীকা সালেহীন ও শ্রেষ্ঠ লোকদের	১৫
দ্বিতীয় তরীকা রিয়াযত, মুজাহাদা এবং সাধনাকারীদের	১৫
তৃতীয় তরীকা শাত্তারীয়াগণের	১৫
বায়'আত গ্রহণের তরীকা	১৬
প্রথম অধ্যায়	
চিশ্‌তীয়া তরীকার বুযুর্গদের যিকির-	
শুগল ও মুরাকাবাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা	১৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	
তাওয়াজ্জু দেওয়ার নিয়ম	১৯
দ্বিতীয় তরীকা	১৯
যিকির	২১
যিকিরের স্তরসমূহ	২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
নফী ও ইসবাহের দ্বিতীয় পদ্ধতি	২৫
ইসবাতে মুজারাদ	২৫
ইসমে যাত (আল্লাহ্)-এর যিকির পদ্ধতি	২৬
নফী ও ইসবাত যিকিরের অন্য একিট পদ্ধতি	২৭
পাস-আনফাসের প্রথম পদ্ধতি	২৯
সরল ও মেধাহীন মুরীদের দ্বিতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি	৩০
ইসমে যাত (আল্লাহ্)-এর মৌখিক যিকির পদ্ধতির বর্ণনা	৩০
জরবসহ ইসমে যাতের যিকির পদ্ধতি	৩১
দ্বিতীয় পদ্ধতি	৩২

চার জরবী যিকিরের দ্বিতীয় পদ্ধতি ৩২
ইছমে যাত কলন্দরীর পদ্ধতি ৩২
যিকরে জারুবের পদ্ধতি ৩২
যিকরে হাদ্দাসীর পদ্ধতি ৩২
যিকরে আরার পদ্ধতি ৩৩
যিকরে আরার দ্বিতীয় পদ্ধতি ৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায়
যিকিরের গুগল ও অজীফাসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা ৩৪
খাতরাতে ফাসেদা বা ফাসেদ ওয়াসওয়াসা
বিদূরগণকারী যিকিরের বর্ণনা ৩৪
হাবসে নফী ও ইসবাত পদ্ধতি ৩৫
হাবসে নফী ও ইসবাতের দ্বিতীয় পদ্ধতি ৩৫
শুগলে সেপায়ার চিশ্‌তীয়া পদ্ধতি ৩৬
কুরব বা নৈকট্য দুই প্রকার ৩৭
'সুলতানান্ নাসীরা' গুগল পদ্ধতি ৩৮
'সুলতানান্ মাহমুদা' গুগল পদ্দতি ৩৮
সুলতানুল আযকার গুগল পদ্দতি ৩৮
সুলতানুল আযকার যিকির পদ্ধতি ৩৯
শুগলে সারমদী পদ্ধতি ৩৯
শুগলে বিসাত পদ্ধতি ৪১
প্রথম পরিচ্ছেদ
আনওয়ারাত (ঐশী জ্যোতিমালা) ও মুরাকবাসমূহের বর্ণনা ৪২
দ্বিতীয় মুরাকাবা ৪৩
মুরাকাবা এ-রুযাত বা পরম সাত্তার দর্শন ধ্যান ৪৩
মুরাকাবা-এ-মায়িআত বা পরম সত্তার সংসর্গের ধ্যান ৪৩
মুরাকাবা-এ আকরাবিয়্যাত
বা পরম সত্তার নৈকট্যের ধ্যান ৪৩

মুরাকাবা-এ-ওয়াহদাত বা একত্বের ধ্যান ৪৩
মুরাকাব-এ-ফানা বা স্বীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির ধ্যান ৪৪
অন্যান্য ধরনের মুরাকাবা ৪৪
অন্য একটি মুরাকাবা

ফানার বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা

প্রথম স্তর, দ্বিতীয় স্তর, তৃতীয় স্তর, চতুর্থ স্তর ও পঞ্চম স্তর ৪৮
ভাল এবং মন্দ, নূর বা জ্যোতিরাশির অবস্থাসমূহ ৫২
কাদরিয়া জিলানিয়া তরীকার বিভিন্ন যিকির শুগুল ৫৬
হাবসে ও নফ ইসবাত পদ্ধতি ৫৬
পাস আনফাস পদ্ধতি ৫৬
জরবসহ ইছমে যাত (আল্লা) যিকির পদ্ধতি ৫৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাদরিয়া তরীকার শুগল অযীফাসমূহের বর্ণনা ৫৮
ইসমে যাত খুফিয়া (গোপন যিকির) পদ্ধতি ৫৮
বারযাখ-ই আকবর শুগল ৫৮
ইসমে যাত শুগল পদ্ধতি ৫৮
কাদরিয়া শুগলে দাওরা পদ্ধতি ৫৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাদরিয়া তরীকার মুরাকাবাসমূহের বর্ণনা ৬০
দ্বিতীয় মুরাকাবা ৬০
বিশেষ বিশেষ আয়াতের মুরাকাবা পদ্ধতি ৬০
প্রথম ঃ মুরাকাব-এ তওহীদে আফআলী
বা ক্রিয়াগত একত্বের ধ্যান ৬১
দ্বিতীয় ঃ মুরাকাব-এ-তওহীদে সিফাতী
অর্থাৎ গুণগত একত্বের ধ্যান ৬১
তৃতীয় মুরাকাবা ৬২
রোগমুক্তির যিকির ৬৩

রূহ ও ফেরেশতাগণের সাক্ষাৎ লাভের যিকির ৬৩
ভবিষ্যত সংবাদ লাভ করার যিকির ৬৩
মুশকিল জিনিস হাসিল করা এবং
ভব্যিষত সংবাদ জানার যিকির ৬৩
কাশফে কুবুর বা কবরের অবস্থা
সম্পর্কে অবগত হওয়ার যিকির ৬৩
দ্বিতীয় পদ্ধতি ৬৪
রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের
রূহ মুবারক অবলোকন করার যিকির ৬৪
প্রয়োজন পূরণের যিকির ৬৪

তৃতীয় অধ্যায়

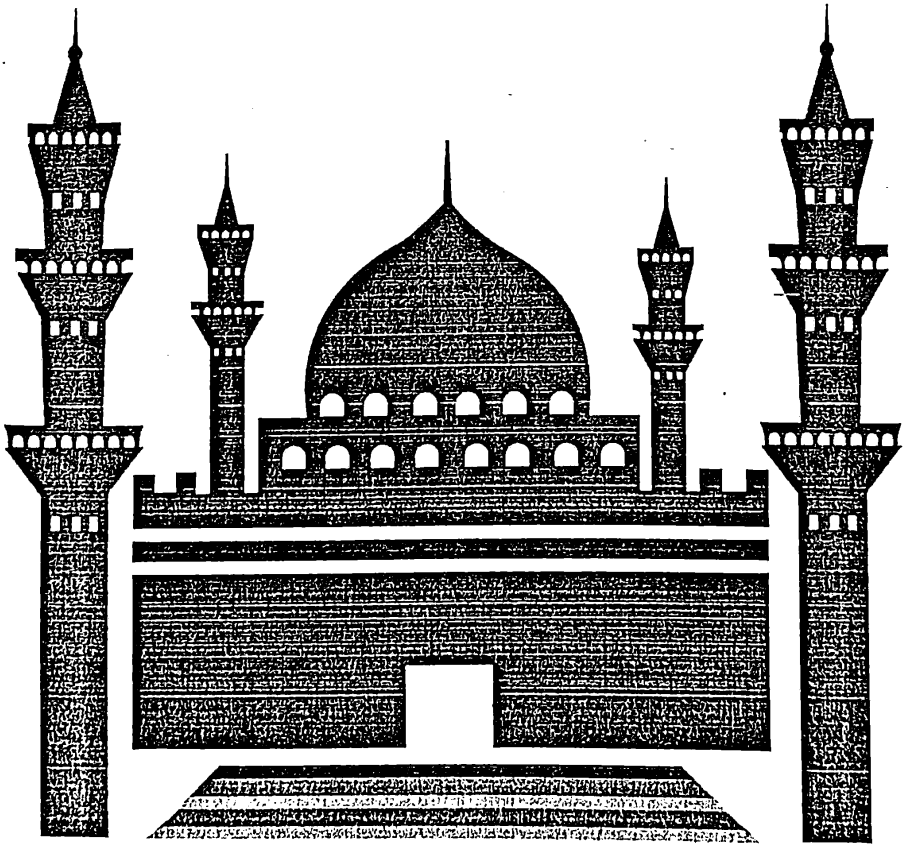
নক্শবন্দিয়া তরীকার যিকির ও শুগলসমূহের বর্ণনা ৬৫
ইস্তেখারা করার নিয় ৬৫
লতায়িফে সিত্তা এবং উহাদের যিকির পদ্ধতি ৬৬
ছয় লতীফার শুগল বর্ণনা ৬৮
যিকরে জারূব পদ্ধতি ৬৮
যিকরে আরো পদ্ধতি ৬৮
সুলতানুল আযকার পদ্ধতি ৬৯
নফী ও ইসবাতের যিকির পদ্ধতি ৭০
নফী ও ইসবাতের শুগল পদ্ধতি ৭০
তাওহীদে আফআলীর মুরাকাবা পদ্ধতি ৭০
মুরাকাবা-এ নায়াফ্ত পদ্ধতি ৭২
কতিপয় পরিভাষা ৭৫
পীর ও মাশায়েখের তাসাররুফ
(ক্রিয়া ক্ষমতা প্রদর্শন) ও তাওয়াজ্জুহ পদ্ধতি ৭৭
অসুস্থতা বিদূরণ পদ্ধতি ৭৭

অসুস্থতা বিদূরণের এবং পাপ হইতে
তওবা নসীব হওয়ার দ্বিতীয় তদবীর ৭৮
জীববিত বা মৃত আল্লাহওয়ালাগণের
নিসবত সম্পর্কে অবিহিত হওয়ার তরীকা ৭৮
মনের খাতরাত অর্থাৎ ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পদ্ধতি ৭৮
ভবিষ্যত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পদ্ধতি ৭৮
বালা-মুসীবত দূর করার উপায় ৭৯

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন তিলাওয়াত, নামায এবং অন্যান্য আমলের বর্ণনা ৮০
কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের নিয়ম ৮১
উপসংহার ৮২
নামায পদ্ধতি ৮৩
নামায আদায়ের দ্বিতীয় পদ্ধতি ৮৫
নামায আদায়ের অন্য একিট পদ্ধতি ৮৭
রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি
ওয়া সাল্লামের স্বপ্নে যিয়ারত লাভের তরীকা ৮৭
কুন্ ফায়াকুন্ নামায পদ্ধতি ৮৯
ইস্তেখারার নামায পদ্ধতি ৮৯
ইস্তেখারার দ্বিতীয় পদ্ধতি ৯১
অন্য আরেকটি পদ্ধতি ৯১
সকাল ও বিকালের বিভিন্ন আমলের বর্ণনা ৯১
খতমে খাজগোন পড়ার নিয়ম ৯৫
চিশ্‌তীয়া খতমে খাজেগান পদ্ধতি ৯৫
কাদরিয়া তরীকা খতমে খাজেগান পদ্ধতি ৯৫
সুলুকের বাধাসমূহ এবং এইগুলি দূরীকরণের উপায় ৯৬
তাফরিকা বা মানসিক অস্থিরতার ধরণ
এবং ইহার চিকিৎসা ৯৭

চিল্লার নিয়ম ও পদ্ধতি ১০১
খেলওয়াতের শর্তসমূহ ১০২
কতিপয় বিশেষ উপদেশ ১০২
মাশায়েখে তরীকত রিযওয়ানুল্লাহি আলায়হিমের সিরসিলাসমূহ ১০৭
চিশতীয়া সাবিরিয়া কুদ্দুসিয়া সিলসিলার বর্ণনা ১০৭
চিশতীয়া নিযামিয়া কুদ্দুসিয়া সিলসিলা ১০৮
কাদরিয়া কুদ্দুসিয়া সিলসিলা ১০৮
কুদ্দুসিয়া নক্‌শবন্দিয়া সিলসিলা ১০৯
সোহরাওয়ার্দীয়া কুদ্দুসিয়া সিলসিলা ১১০
কিবরিয়া কুদ্দুসিয়া সিলসিলা ১১০



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ -

সকল মরতবার প্রশংসা কেবল ঐ এক সত্তার জন্যই নির্দিষ্ট, সমস্ত সৃষ্টি যাহার ইবাদত করে। তিনি তাঁহার অস্তিত্বে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত। অনেক বিরাট মরতবা তাঁহার। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্যই হইতেছে সকল প্রকার নেয়ামত ও অনুগ্রহ, যিনি হইলন পৃথিবীর সৃষ্টির কারণ। তিনি হইলেন এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র যথার্থ খলীফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার মুতাআল্লিকীন এবং সাথীদের উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন।)

হামদ ও ছানার পর মাজমাউল ফাজায়িল ওয়াল মানাকিব-মর্যদাা ও গুণাজির সমাবেশ ক্ষেত্র, ছাহিবুশ্ শরীয়াত ওয়াত তরীকত, মওলানা ওয়া মুর্শিদানা ওয়া হাদিয়ানা মিয়াজী নূর আহমাদ ঝানঝানাবী চিশতী কুদ্দিসা সিরুহুর নগণ্য এক খাদিম, দরগাহ আকদাসের হীন এক ধূলিকণা, ইমদাদুল্লাহ ফারুকী চিশতীর আরজ এই যে, আমার কিছু তরীকত অনুসারী দোস্ত বিশেষ করিয়া ইমামুল আশিকীন, আরিফ বিল্লাহ, কামিলে আকমাল হরযত হাফিজ যামিন শহীদ ফারুকী চিশতী[১] (রঃ)-এর প্রিয় পুত্র হাফিজ মুহাম্মদ আমাকে বারংবার তাগিদ দিয়া বলিয়া দিলেন যে, আমল করার জন্য এবং ভবিষ্যতেও তদনুসারে চলার সুবিধার জন্য চিশতীয়া ছাবিরিয়া কুদ্দুয়িা তরীকার প্রচলিত যিকির-গুগল ও মুরাকাবা (ধ্যান) ইত্যঅদির নিয়ম প্রণালী সম্পর্কে যেন একটি কিতাব রচনা করিয়া দেই। কারণ, খানায়ে কাবা হেরেম শরীফে এই দীন-হীনের অভস্থঅনের দরুন সব সময় দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ হইয়া উঠে না। তিনি আরো বলিলেন, "আপনি কোথায় হেরেম শরীফের খেদমতে লিপ্ত আর আমরা কোথায় হিন্দুস্তানে কার্যকর কোন উপায় নাই। তাই আপনাকে ঐ ধরনের একটি কিতাব লিখিতেই হইবে।" এই অধমের অনুপযুক্ততা উক্ত হুকুম পালনের ক্ষেত্রে যদিও বাধা হইয়া দাঁড়াইত তবুও উল্লেখিত বুযুর্গদের বারংবার

তাগিদের দরুন উহা তামিল না করিয়াও কোন পথ পাইতেছিলম না। শেষে দরগাহে আহাদিয়াত, খোদাওন্দে করীমের দরবারে এই বিষয়ে সাহায্য প্রার্থী হইলাম এবং সেই সুমহান দরবার হইতেও এই ধরনের একখানা কিতাব রচনা রনির্দেশ গপাইলাম। (আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর চিরায়ত রীতি এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি মানুষের ভক্তি বিশ্বাস জন্মে তাহার লেখা ও কথা দ্বারা তিনি অবশ্যই মানুষকে উপকার পৌঁছাইয়া থাকেন।) তাই এই মহনা তরীকার মুরুব্বী ও পীর-মুর্শিদগণের মাধ্যমে এই চিশতীয়া কাদিরিয়া নকশাবন্দিয়া সিলসিলার যিকির-আযকার ও শুগল সম্পর্কে আমি যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহা একিট কিতাবে একত্রিত করার প্রয়াস পাইতেছি। আমার এই প্রচেষ্টা হয়ত বা ফলপ্রসূও হইতে পারে। ফলে, যে সকল বুযুগাণের বারংবার তাগিদ আমাকে ইহা করিতে বাধ্য করিয়াছে তাঁহাদেরও কিছু কার্যকর উপকার এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্যের কিছুটা পূরণ হইলেও পারে।

وَاللّٰهُ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمَ -

আল্লাহ্ যাহাতে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

জানিয়া রাখা উচিত, কাদরিয়া এবং চিমতিয়া তরীকার যিকির-শুগল একটি অন্যটির সহিত এমনভাবে মিশিয়া পড়িয়াছে যে, ইহাদের মধ্যকার স্বাতন্ত্র্যগত বৈশিষ্ট্য যেন প্রায়ই লোপ পাইয়া গিয়াছে। এমনকি এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিশেষ যিকির-আযকারও অনেক সময় আদায় কিরয়া থাকেন। যাহোক, উভয় তরীকার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক বিধায় আমিও উভয় সিলসিলার যিকির শুগলসমূহ একত্রে উল্লেখ করার ইচ্ছা করিয়াছি। বুদ্ধিানদের নিকট এতদুভয়ের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইয়া যাইবে। 'যিয়াউল কুলুব' বা হৃদয়ের আলো নামে আমি ইহার নামকরণ করিতেছি। আল্লাহ্ই সমস্ত তওফীকের মালিক।

উক্রমণিকা

জানিয়া রাখ, (আল্লাহ্ তোমাকে সুলুকের পথে সাহায্য করুন) সালিক অর্থাৎ আল্লাহর রাহের যাত্রীকে আল্লাহ্র পথে চলার এবং সীরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথে যাত্রার তওফীক যখন দেওয়া হয়, তখন তাহার অন্তর আনওয়ারে হেদায়েত বা হেদায়েতের জ্যোতিতে আলোকিত এবং প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে গুমরাহী এবং পথভ্রষ্টতার অন্ধকার বিদূরিত হইয়া যায় يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ - আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহার নূর অর্জনের হেদায়েত করিয়া থাকেন। আর এই আল্লাহ্ প্রদত্ত নূরের প্রভাবে তাঁহার অন্তরে দুনিয়া প্রতি ঘৃণা এবং আখিরাতের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। স্বীয় পাপকার্যসমূহের কথা স্মরণ করিয়া তওবা ইস্তেগফারের রজ্জু হাতে লইয়া গাফুর ও রহীম অনন্ত-ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় এবং সকল হাজত পূরণের কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ্ রারুল ইযযতের হুজুরে সে রুজু হয়। এমন সময় কোন একজন কামিল মুরশিদের দরবারের নিশংক আশ্যয় ব্যতীত পুরাপুরি সফলকাম হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না। সুতরাং তাহার জন্য এমন সময় শরীয়ত ও তরকীত উভয় বিষয়ে অভিজ্ঞ মুরশিদের গোলামীর গৌরব অর্জণ করা উচিত। ইহাতে সে শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও কু-প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের তাড়না হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে। বাতেনী রোগসমূহের ব্যাপারে এই সত্য ও সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসক কর্তৃখ নির্ণিত ঔষধ পথ্যাদিই তাহার ব্যভহার করা কর্তব্য। কেননা, বাতেনী রোগসমূহের (যথা হিংসা, কৃপণতা, অহংকার, দ্বেষ, রিয়া ইত্যাদি) মূলোৎপাদন ব্যতিরেকে জ্ঞান, সহনশালতা, বদান্যতা, বিনয়াবনবতা, নিজেক ছোট মনে করা, কম খাওয়া, কম কথা বলা ইত্যঅদি সদ্গুণ নিজের মধ্যে পয়দা করা সম্ভব হইবেনা, আর তত দিন পর্যন্ত আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভও সম্ভব হইয়া উঠিবে না। এইজন্যই কোন মুরশিদে কামিলের দরবারে হাজিরী দেওয়া প্রয়োজনীয় বরিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর, আর সত্যপরায়ণদে সহিত থাকিও।'

অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেন ঃ وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ

'যাহারা আমার দিকে রুজু হয়, তাহাদের পথ অনুসরণ কর।'

এই উভয় আয়াতেই আজ্ঞাবচক মন্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই নির্দেশটি অবশ্য পালনীয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে উহা ওয়াজিব। বায়'আত হওয়া এবং মুর্শিদে কামিলের হস্ত ধারণ করা এমন একটি কজা যাহার সম্পর্কে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এবং সাহাবা-এ-কিরামের সহিত আরোপিত। কালামে পাকে ইরশাদ করা হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ـ

'হে নবী, আপনার হাতে যাহারা বায়আত করে তাহারা মূলত ঃ আল্লাহর হাতেই বায়ৎআত করে।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْ يُبَا يِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

বৃক্ষের নিচে যখন তাঁহারা (সাহাবীগণ) আপনার হাতে বায়ৎআত করিতেছিলেন।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, 'উম্মতের তুলনায় নবীর মর্যাদা যেমন, শায়খ ও মুর্শিদের মর্যাদাও তাঁহার সম্প্রদায়ে তেমন।' এই বিষয়ে বুযুর্গানে দ্বীনের অভিমত হইল, যে ব্যক্তি আল্লাহু রাব্বুল আলামীনের সাহচর্য লাভের আগ্রহ করে তাহার সুফী-ওলীউল্লাহগণের খেদমতে হাযিরী দেওয়া উচিত। শায়খগণ যেহেতু নায়েবে-নবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত, সুতরাং তাঁহাদের খেদমত করাও একান্ত জরুরী। যে ব্যক্তি শায়খে কামলের খেদমতে নিজের সময় কাটাইবে এবং তাঁহাকে নিজের উপর পূর্ণ অধিকার দিয়া দিবে, তাহার সম্পর্কে দৃঢ় আশা করা যায় যে, অবশ্যই সে স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হইতে পারিবে।

তাম্বীহ ঃ এখন আমি সংক্ষেপে সুলুকের বিভিন্ন তরীকা সম্পর্কে লিখার ইচ্ছা রাখি। প্রতি রোগেরাই যেহেতু স্বতন্ত্র চিকিৎসা পদ্ধতি রহিয়াছে, তাই বাতেনী ব্যাধি সম্পর্কে অভিজ্ঞ চিকিৎসক অর্থাৎ প্রত্যেক যামানার শায়খে কামিলগণও স্বতন্ত্র ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। একজন্যই সুলুকের মধ্যে অসংখ্য তরীকার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল তরীকার পর্যালোচনা করিলে নিম্নোক্ত তিনটি অভিমতকে পরস্পর নিকটবর্তী পাওয়া যায়।

প্রথম তরীকা সালেহীন ও শ্রেষ্ঠ লোকদের ঃ এই তরীকায় শরীয়তের সকল ফরয কাজ যথা- রোযা, নামায, তিলাওয়াতে কুরআন, জিহাদ, হজ্জ ইত্যাদি আদায় করিয়া চলিতে হয়। এই পদ্ধতিতে মনজিলে মকসুদে পৌঁছাইতে কিছুটা বিলম্ব ঘটে।

দ্বিতীয় তরীকা রিয়াযত, মুজাহাদা এবং সাধনাকারীদের ঃ এই তরীকায় চারিত্রিক দোষসমূহকে সদগুণাবলীর দ্বারা এবং সকল ধরনের বক্রতাকে সুন্দর নৈতিক গুণাবলী দ্বারা পরিবর্তিত করিয়া নেওয়া হয়। এই পথে অধকাংশ ক্ষেত্রেই সফলকাম হওয়া যায়।

তৃতীয় তরীকা শাত্তারিয়াগণের ঃ ইহারা সকল জাগতিক আবিলতা হইতে নিজেদের সম্পর্কছেদ করিয়া মানুষের সংসর্গ হইতে আলাদা হইয়া থাকেন। প্রেমাস্পদের তীব্র মিলন আগ্রহ এবং যিকর ও শুকর, স্মরণ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভিন্ন ইহাদের রক্ষ্য পথে আর কিছুই থাকে না। তাহাদের দৃষ্টিতে কাশ্‌ফ ও কারামত তেমন কোন গুরুত্ব রাখে না। مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا মৃত্যুর পূর্বেই মরিয়া যাওয়ার অনুশীলনে দৃঢ়তার সহিত তাঁহারা নিজেদের সময় ব্যয় করেন। এই তরীকায় প্রথমোক্ত দুই তরীকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত মূল উদ্দেশ্যে সফলকাম হওয়া যায়। এই তরীকায় সফল হয়ার জন্য দশটি উপায়।

এক—ভওবা অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতত আর কিছু মতলুব ও মকছুদ যেন না থাকে। মৃত্যুর সময় যেমন মানুষের সামনে জাগতিক কিছুই থাকে না, তেমনি এই খানেও যেন সামনে আর কিছুই না থাকে।

দুই—যুহদ অর্থাৎ অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যেমন জাগতিক সকল স্মপর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তেমনি এইখানেও যেন দুনিয়া ও ইহার কোন কিছুর সহিত তাহার কোনরূপ সম্পর্ক না থাকে।

তিন—তাওয়াক্কুল, মৃত্যুর সময় যেমন জাহেরী আসবাব ও জাগতিক উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া ফেলিতে হয় তেমনি এই জগতেও যেন এইসব কিছু পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া তাকে।

চার— কানা'আত, মৃত্যুর সময় যেমন নফসানী কোন খাহেশ, রিপু প্রবৃত্তিত্তর কোন তাড়না অবশিষ্ট থাকে না, এই খানেও যেন তা না থাকে।

পাঁচ— আযলত, অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যেমন মানুষের সঙ্গ লাভের আর কোন সুযোগ থাকে না, তেমনি এখানেও যেন সে মানুষের সংসগ হইতে দূরে থাকে।

ছয়—তাওয়াজ্জুহ, অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যেমন একজনের লক্ষ্য শুধুমাত্র আল্লাহর দিকেই নিবদ্ধ থাকে, তেমনি এই জগতেও যেন তাহাই থাকে।

সাত—সবর, অর্থাৎ মৃত্যুর সময়কালের মত এইখানেও যেন যে সকল জাগতিক সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ফেলে।

আট—রোযা, অর্থাৎ মৃত্যুর সময়কালের মত জীবিতকালেও যেন নিজের ইচ্ছা-অভিরুচি পরিত্যাগ করিয়অ কেবলমাত্র আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার উপরই তুষ্ট হইয়া থাকে এবং তাঁহার সনাতন হুকুম-আহকাম পালনে রত থাকে।

নয়—যিকর, অর্থাৎ মৃত্যুর সময়কালের মত জীবিতকালেও যেন সে সকল কছুির যিুকির ও স্মরণ পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর যিকির ও স্মরণেই কেবল লিপ্ত হইয়া থাকে।

দশ—মুরাকাবা অর্থাৎ মৃত্যুর সময়কালের মত এই খানেও যেন সে নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থৎ ত্যাগ করিয়া দেয়।

মোটকথা, প্রত্যেক আল্লাহ্র মিলন প্রত্যাশীর উচিত শায়খে কামিলের অনুসরণের মাধ্যমে বস্তু আবিলথার অবশ্যম্ভাবী ফল সকল প্রকার অসৎ অভ্যাস হইতে নিজেকে রক্ষা করা এবং সৎ সুন্দর চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করিয়া তোলা আর শুধুমাত্র আল্লাহর ধ্যান ব্যতীত আর কিছুই যেন তাঁহার অন্তরে স্থান না পায়।

বায়'আত গ্রহণের তরীকা ঃ বায়ৎআত লওয়ার সময় মুরীদকে নিজের সম্মুখে বা-আদব বসাইয়া নিম্নোক্ত খুৎবাটি প্রথমে পাঠ করা উচিত। اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ হইতে لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ اَلْحَمْدُ পর্যন্ত পড়িয়া নিজের জাত মুরীদের হাতে রাখিবেন ও নিজের يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ হইতে لَنَا وَلَكُمْ بَارَكَ اللّٰهُ পর্যন্ত পাঠ করবেন। মুরিদ যদি মহিলা হয় তবে উল্লেখিত তরীকার স্থলে রুমাল, চাদর বা পাগড়ীর একদিক তাহার হস্তে দিবেন। প্রত্যেক মুরিদের যবানে বলাইতে হইবে, আমি সকল প্রকার শিরক ও কুফর হইতে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করিতেছি এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার সত্য নবীর উপর পুরাপুরি ঈমান আনিতেছি। কেবলমাত্র ইসলামকেই আমার জীবনের একমাত্র জীভনব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করিতেছি। কৃত গুনাহর জন্য আমি অনুশোচিত এবং ভবিষ্যতেও সকল প্রকার গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার ওয়াদা করিতেছি। শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরেই দুনিয়া ও ইহার সম্ভোগ আমি পরিত্যাগ করিলাম। ইহার পর পাল করিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ (১) مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ -

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আমরা তাঁহারই প্রশংসা করি, তাঁহার নিকট আমরা ক্ষমা ভিক্ষা কলি্ নফসের দুষ্ঠামী ও আমলের খারাবী হইতে আমরা আল্লহারই আশ্রয় চাই। তিনি যাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন তাহাকে কেহ পথভ্রস্ট করিতে পারে না। আর তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার হেদায়েত করার কেহ নাই। আর আমরা সাক্ষ দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ 'ইলাহ' বা মাবুদ নাই। তিনি এক, তাঁহার কেহ শরীক নাই। আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল। হে মুমিনগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁহার নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা অনুসন্ধান কর। আর তাঁহার পথে তোমরা সচেষ্ট হও যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। (হে নবী), যাহারা আপনার হাতে বায়'আত হইতেছে তাহারা মূলত আল্লাহর হাতেই বায়'আত হইতেছে।

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى (১) نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهُ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا وَنَفَعَنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ -

আল্লাহর হাত তাহাদের হাতের উপর। যে ব্যক্তি চুক্তি ভঙ্গ করিবে উহার ক্ষতি তাহারই উপর বর্তাইবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত কৃত ওয়াদা ও চুক্তি রক্ষা করিবে অতি শীঘ্র তাহাকে মহান প্রতিদান দেওয়া হইবে। আল্লাহ্ আমাকে ও আপনাদের সকলকে উপকৃত করুন এবং বরকত দিয়া অভিষিক্ত করুন।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّمُحَمَّدٍ نَبِيًّا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

'আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে একমাত্র ধর্ম হিসাবে আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসাবে আমি গ্রহণ করিয়া লাইলাম।' ইহার পর কলেমা-এ শাহাদত পড়িবে, পরে বলিবে, 'আমি অমুকের পুত্র অমুক শায়খের হস্তে অমুক সিলসিলা অনুসারে বায়'আত হইলাম।' ইহার পর দু'আ করিবে, "হে আল্লাহ্! এই সিলসিলার সুপবিত্র বুযুর্গদের কয়েজ ও বরকত হাসিল করার তওফীক তুমি আমাকে দান কর। হাশরের ময়দানে ইহাদের সহিত আমাকে উঠাও।" ইহার পর শায়খ মুরীদের যোগ্যতা ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া যিকির করার তালীম দিবেন। শায়খের উচিত সুলুকের আদব-কায়দা তাহাকে শিক্ষা দান করা, সর্বদা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা। মুরীদকে এই কথা ভালভাবে জানাইয়া দিতে হইবে যে, শরীয়তের হুকুম-আহকামের পাবন্দী ব্যতীত এই পথে কখনও সফল হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালনের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা উচিত। শায়খ মুরীদের আকীদা ও ঈশানের ইসলাহ ও সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। তাহাকে ভাল কিরয়া বলিয়া দিতে হইবে, শরীয়তের সীমার বিপরীত কাশফ ও বুকাশাফা হইলে উহার কোনই মূল্য নাই। হারাম কাজ হইতে দূরে থাকার এবং কবীরা গুনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকার খুবই তাগিদ দিবেন। স্পষ্ট বলিয়া দিতে হইবে, যিকির-শুগলের তুলনায় শরীয়তের হুকুম-আহকামের স্থান সকলের আগে।

প্রথম অধ্যায়

চিশতীয়া তরীকার বুযুর্গদের যিকির-শুগল ও মুরাকাবাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

যিকির তালকীন করিতে গিয়া শায়খ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের রূহের উপর ফাতিহা ও খতম আদায় করার পর মুরিদকে পর পর তিন দিন একসঙ্গে রোযা রাখিতে নির্দেশ দিবেন। এই তিন দিন কারিমায়ে তাইয়্যিবা, ইস্তেগফার ও দরূদ শরীফ অধিক হারে আদায় করারও তিনি নির্দেশ দিয়া বলিলেন 'তৃতীয় দিন শেষ রাতে বা বাদ ফজর বা বাদ আছর আমার নিকট আসিবে। তৃতীয় দিন মুরিদ আসিয়া হাযির হইবে তাহাকে নির্জন কোন স্থানে লইয়া যাইবেন। সেখানে যেন আর কেহ না থাকে। তাহাকে আদব সহকারে সামনে বসাইয়া প্রথমে তাওয়াজ্জুহ দিবেন, যেন তাঁহার মন সহজে যিকর-শুগলসমূহ গ্রহণ করিয়া নিতে পারে!

তাওয়াজ্জুহ দেওয়ার নিয়ম ঃ মুর্শিদ প্রথম সমস্ত ধরনের ধ্যান ও চিন্তা হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিয়া লইবেন এবং পরে মুরিদের অন্তরকে নিজের অন্তরের মুশামুখী করিয়া তাহার অন্তরে আল্লাহ্‌র ইসমে যা (অর্থাৎ আল্লাহু)- এর জরব লাগাইবেন। এই কথার ধ্যান করিবেন যে, আমার মাধ্যমেই এই বীক্তর অন্তরে যিকিরের বর্তমান কাইফিয়্যাত ও হাল হাসিল হইতছে এবং এই যিকির তাহার অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যাইয়া প্লাবিত হইতেছে। একশত একবার অন্তত এই জরব তিনি লাগাইবেন যাহাতে আল্লাহ্‌র প্রতি বিপুল আগ্রহ ও যিকিরের উষ্ণতার প্রভাব ঐ মুরিদের অন্তরে যাইয়া প্রভাবশীল হইতে পারে এবং তাহার অন্তর যেন যিকিরে আলোড়নে আলোড়িত হইয়া উঠিতে পারে। অতঃপর শায়খ মুরিদের যোগ্যতা ও অবস্থা বুঝিয়া তদনুসারে যিকির বাতলাইয়া দিবেন। মুরিদকে শায়খের নির্দেশিত যিকির-শুগলে মশগুল থাকিতে হইবে। বাতেনী বেদসমূহ যেন অন্য কাহারো সামনে সে প্রকাশ না করে। ইহাতে তাহার আরো অধিক আনওয়ার ও বাতেনী ভেদ হাসিল হইবে।

দ্বিতীয় তরীকা ঃ দু'আ ও যিকিরসমূহ শায়খ ও একবার একবার পড়িয়া যাইবেন আর মুরিদ উহা চুপ করিয়া শুনিবে। এরূপ তিনবার করার পর শায়খ মুরিদকে ছোট ও অন্ধকার একটি কুঠুরিতে অবস্থান করার তালিম দিবেন।

কুঠুরীটি যেন কোনক্রমেই শুয়া এবং দাঁড়ানো যায় ইহার চাইতে অধিক বড় না হয়। বাইরের শোরগোলের কোন শব্দ যেন ইহাতে না আসে।

মুরিদ পাক-সাফ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র হইয়া উক্ত কুঠুরীতে প্রবেশ করিবে। পরে চার জানু হইয়া এমন ভাবে পিঠ সোজা করিয়া বসিবে যেন শিরদারা সোজা খাড়া হইয়া থাকে। চক্ষু মুদিয়া ফেলিবে। উভয় হাত উভয় হাটুর উপর রাখিবে। আঙ্গুলীসমূহ খোলা রাখিবে, যাহাতে এগুলি আল্লাহর নামের একটা নকশার রূপ দারণ করে। অতৎপর ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা 'কীমাস' নামক রগটি (বাম হাঁটুতে অবস্থিত একটি রগের নাম। কলবের সাহিত ইহা। সরাসরিভাবে সংযোজিত। ইহার সঞ্চালন এবং উষ্ণতা কলবের উপর খুবই প্রভাবশীল হয়। চাপিয়া ধরিবে। ইহার পর কুশু-কুজু এবং ধ্যান ও বিনয়নম্রতার সহিত يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ শেষ পর্যন্ত পাঠ করিবে। পরে মুহাসাবা ও মুজাহাদার সহিত খুব ফিকির, ধ্যান লক্ষ্য এবং ওসিলাসহ সশব্দে বা নিঃশব্দে যেভাবে তাহার আনন্দ, আগ্রহ এবং যিকিরের অতিপ্রিয় স্বাদে আত্মমগ্নতা ঘটে সেইভাবেই খুবই তাওয়াজ্জু, শক্তি ও জোরের

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْئَلُكَ اَنْ تُحْيِ قَلْبِيْ (১) بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا ـ

অর্থাৎ, হে চিরঞ্জীব ! হে নেগাহবান ! আপনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ বা মাবুদ নাই। আপনার কাছেই প্রার্থনা করি আপনার মারিফাতের জ্যোতিতে আমার কলব চিরদিনের জন্য সঞ্জীবিত করিয়া দিন।

সহিত যিকিরে নিমগ্ন হইবে। গায়রুল্লাহ বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিচুর খেয়াল যদি কখনো আসে তবে শায়খের দীদারের মাধ্যমে উহা বিদূরিত করিবে এবং মিমমত যথারীতি যিকির-শুগল আদায়ে মগ্ন হইয়া থাকিবে। ইহাতে মানবিক দুর্বলতার দরুন যে সমস্ত ওয়াসওয়াসা ও অমূলক খেয়ালের সৃষ্টি হয় তাহা বিদূরিত হইবে এভং অন্তরের নির্মলতা ও নফসের সংশোধন সম্ভব হইবে। ফরে এই যিকিরের প্রভাব তাহার সকল অঙ্গ ও শিরা-উপশিরায় প্রকাশ পাইবে; সে গায়বী নূর ও জ্যোতি উন্মোচনের বিকাশ ক্ষেত্র হইতে পারিবে; প্রতিটি বস্তুর মূল তাৎপর্য ও হাকীকত তাহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়া ইঠবে। রূহানী জগতের সহিত যোগাযোগ ও দেখা সাক্ষাত, হাকাকী যিকির এবং আল্লাহ্‌কে সতত সমক্ষে প্রত্যক্ষ করার যে তওফীক পাইবে।

ফা ঃ যিকিরকারী যখন এতটুকু পূর্ণতায় পৌঁছায় যে, তাহার কালব সঞ্চালনের উপলব্ধি তাহার হৃদয়ের ভাষায় ব্যক্ত হইতে শুরু করে, তখন তাহার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কালবের ঐ হরকত বা সঞ্চালনের বিস্তা রঘটে। প্রারম্ভে কালবের জন্য নির্দিষ্ট কোন অঙ্গের হরকত শুরু হয়, পরে কখনো কখনো হাত, কখনো বা পা, আর কখনো বা মাথা হরকত করা ছাড়াই বা দুলান ব্যতীতই দুলিতে থাকে; হরকত হইতে থাকে। এমন কি সমস্ত পৃথিবীটাকেই তাহার সহিত সে আলোড়িত ও সঞ্চালিত হইতে দেখিতে পায়।

যিকিরের এই নূর ও জ্যোতি যখন হরকত করা শুরু করে তখন সমস্ত শরীরে ইহার বিস্তার ঘটে এবং অতি অল্পকালেই তাহা ক্রমে সমস্ত শরীরকে বেষ্টন করিয়া ফেলে। যিকিরের দরুন তাহার প্রতি বিভিন্ন ধরনের ইনকেশাফাত ও রহস্য উদ্‌ঘাটন হইতে থাকে; বিস্ময়কর ধরনের ঘটনা তাহার নিকট প্রকাশ পাইতে শুরু করে। কোন সময় সে কাঁদতে থাকে, আর কোন সময় হাসে; আবার কোন সময় হয়রান ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বুদ হইয়া পড়ে। এই ধরনের অভস্থাদির প্রতি লক্ষ্য করা মুরিদের পক্ষে উচিত হইবে না বরং সর্বাবস্থায়ই সে যিকির-আযকার ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবে। আল্লাহর মদদ ও সাহায্য যদি তাহার শামিলে হাল হয় তবে সে কখনো কখনো তাহার সমস্ত শরীরকেই যিকির করিতে দেখিতে পাইবে। সকল অঙ্গ তাহার কলবের সঙ্গী হইয়া যিকিরে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। আর সে তখন তাহর প্রতিটি অঙ্গেরই যিকির স্পষ্ট শুনিতে থাকিবে।

সূফীগণের কেহ কেহ বলেন, অদিক হারে যিকির হইতে থাকিলে স্বয়ং যিকিরকার এমনকি অন্যান্য লোকেরা পর্যন্ত ঐ যিকিরের আওয়াজ শুনিতে পায়। তবে এই কথাটির কোন ভিত্তি নাই। কেননা, যিকিরকারীগণের প্রত্যেকেই এই আওয়াজ শুনিতে পায় না। ঐ ধরনের যিকিরকারীই কেবল এই আওয়াজ শুনিতে সমর্থ যে সালিক বা খোদার রাহের যাত্রী হয়। সুফীগণের পরিভাষায় এই ধরনের যিকিরকে 'সুরতানুল-আযকার' বলা হয়।

যিকির ঃ এই পুস্তিকাখানার শুরু হইতে এই পর্যন্ত বেশ কয়েকবার 'যিকির' শব্দটির ব্যবহার হ্য়িাছে। কিন্তু এখনো যিকির বলিতে কি বুঝায় উহার আলোচনা হয় নাই। সুফীগণের পরিভাসায় যিকির বলা হয় আল্লহার স্মরণে এমনভাবে নিমগ্ন থাকা যেন আল্লাহ্ ব্যতীত বাকী আর সকল কিছুই বিস্মুত হইয়া যায়। এবং হুযুরে কলবের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সংসর্গের ধ্যান যেন তাহার অর্জিত হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার নামের যিকিরে তাহার

ওষ্ঠ নড়িতে থাকে তখন আমি তাহার সঙ্গী হইয়া যাই আর আমাকে যে ব্যক্তি স্মরণ করে আমি তাহার সাথী।

سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ـ সকাল বিকাল (সর্বক্ষণ) তোমার আল্লাহর তসবীহ কর।"[১১] কুরআন পাকের এই নির্দেশ অনুসারে পুরাপুরি ধ্যানের সহিত এমনভাবে আল্লাহর যিকিরে মগ্ন হইয়া থাকিবে স্বীয় সত্তার উপলব্ধিও যেন তাহার নিক অবলুপ্ত হইয়া যায়।

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ ـ

যাহার দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শুইয়া অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকিরে মগ্ন সেই সকল মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত যেন সে হয়।

জানিয়া রাখা কর্তব্য, যিকির বহু প্রকার। পরম জনকে লাভ করাই হইতেছে যিকিরের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং নামায, রোযা, দরূদ শরীফ, দু'আ অর্থাৎ যে আমল দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্যে সফলকাম হওয়া যায় তাহাই মূলতঃ যিকির বলিয়া গণ্য। কিন্তু যিকিরকারী যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া না দিতে পারিবে, খোদার অন্বেষীজন যতক্ষণ পর্যন্ত এমনভাবে যিকিরে নিমগ্ন না হইতে পারিবে যদ্বারা আল্লাহ ব্যতীত আর সকল কিছু হইতে সে বিস্মৃত হইয়া পড়িবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার উক্ত লক্ষ্যে সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়। খোদা অন্বেষী ব্যক্তি ঐ মহান মরতবায় যখন পৌঁছিতে পারিবে তখন জুহদ, তাওয়াক্কুল, নির্জনপিয়তা, কানাআত বা অল্পেতুষ্টি, ধৈর্য, তালীম ও রেযা বা আল্লাহর যেকোন ফয়সালা দ্বিধাহীন চিত্তে মানিয়া লওয়া এবং উহার উপরই সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণ তাহার মদ্যে আপনা আপনিই আসিয়া যাইবে। তাহার উপর তখন আনওয়ারে ইলাহীর (আল্লাহর জ্যোতি) এত তাজাল্লী (প্রতিঃসরণ) হইতে থাকিবে যে, ক্রমে তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ অবদমিত ও অবগুণ্ঠিত হইয়া যাইবে এবং যিকির ও যিকিরকারীর সত্তা সকল কিছুই ----------

(১) اَنَا مَعَ عَبْدِىْ اِذَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ وَاَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِىْ ـ

তাহার ধ্যান হইতে অবলুপ্ত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র মাযকুর অর্থাৎ আল্লাহ তা'আরাই তাহার সর্ব উপলব্ধিতে বিরাজ করিতে থাকিবেন। لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ বা মাবুদ নাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এই কালিমার যিকির সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির বলিয়া হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে। ফরে অধিকাংশ পীর ও শায়খ মুরিদদিগকে এই যিকিরেরই তা'লীম দিয়া থাকেন। এখন আমরা যিকিরের কতিপয় স্তর সম্পর্কে উল্লেখ করিতে চাই।

যিকিরের স্তরসমূহ ঃ যিকির চার প্রকার। প্রথম, যিকরে নাসূতী যেমন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। দ্বিতীয়, মালাকূতী যেমন, ইল্লাল্লাহ। তৃতীয়, জাবারুতী যেমন, আল্লাহ, চতুর্থ, লাহুতী যেন, হুয়া হুয়া জানিয়া রাখা দরকার যে, যবানের যিকিরকে নাসূতী, কালবের যিকিরকে মালাকূতী, রূহের যিকিরকে জাবারুতী, সিরির যিকিরকে লাহুতী বলা হইয়া থাকে। আর যবানী যিকিরকে জিস্‌মি (শারীরিক); ধ্যানরূপ যিকিরকে নাফসী (মানসিক), মুরাকাবা করাকে যিকরে কালবী, মুশাহাদাকে (সমক্ষ দর্শন) রূহানী যিকির এবং মুআয়ানা করাকে (উপস্থিত দর্শন) সিরির বলা হয়।

ফা ঃ যিকিরকারী এই যিকির করার কালে লা ইলাহা বলার সময় পৃথিবীর সবকিছুকে নিজ হইতে অবলুপ্ত করিয়া দিবে আর ইল্লাল্লাহ বলার সময় পুনরায় স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ স্থিরাবস্থায় লইয়া আসিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নফী ইসবাত (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), ইসমে যাত (আল্লাহ) এবং চিশতিয়া তরীকায় প্রচলিত বার তসবীহ যিকিরের র্বণনা-বার তসবীহ যিকির করার নিয়শ হইল, ছয় সালাম (অর্থাৎ দুই দুই রাকাত করিয়া) বার রাকাত তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে। প্রতি রাকাতে তিনবার করিয়া সূরা ইখলাসপাঠ করিবে। পরে অতীব বিনয়নম্রতা ও খুশু-খুজুর সহিত তিন বা পাঁচ বা সাতবার হাত উঠাইয়া পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ عَنْ غَيْرِكَ وَنَوِّرْ قَلْبِىْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ -

(আল্লাহুম্মা তাহ্‌হির ক্বালবী আন গায়রিকা ওয়া নাব্বির ক্বালবি বিনুরি মা'রিফাতিকা আবাদান ইয়া আল্লাহম ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ) হে আল্লাহ, তুমি ব্যতীত বাকী সব কিছু হইতে আমার মন পকা করিয়া দাও,

তোমার মা'রিফাতের নূরে আমা রকালব আলোকিত করিয়া তোল সব সময়ের জন্য, হে আল্লাহ্! হে আল্লাহ্! হে আল্লাহ্! পরে তওবা ইস্তগফার করিয়া একুশবার পাঠ করিবে।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

(আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়্যুল কায়্যুমু ওয়া আতুবু ইলায়হি)

রিচঞ্জীব ও চিরস্থায়ী মহান আল্লাহ তা'আলার নিকটই আমি আমার সকল গুনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাজার দিকেই আমি প্রত্যাবর্তন করি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ বা মা'দুন নাই।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ ـ

(আসসালাতু ওয়ালা সালামু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ! আসসালাতু ওয়াস্ সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আসসালাতু ওয়াস্ সালামু আলায়কা ইয়া নাবীয়াল্লাহ) এই দরূদ শরীফ উরুজ ও নজুলের (আরোহ ও অবরোহ) তরীকায় তিনবার পাঠ করিবে এবং চারজানু হইয়া বসিবে। ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং ইহার পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলীর সাহায্যে কীমাস নামক রগটিকে (ঞাঁটুর মধ্যস্থিত একটি শিরা) খুব চাপিয়া ধরিবে, উভয় হাত হাঁটুর ৷উপর ছাড়িয়া রাখিবে এবং কেবলামুখ হইয়া বসিবে। লা ইলাহা বলার সশয় শাহাদাত অঙ্গুলী উঠাইবে; আর ইল্লাহল্লাহ বলার সশয় উহা নামাইয়া ফেলিবে। নিজেকে সুস্থির করিয়া রাখিবে এবং ইখলাস, আন্ত রিকতা এবং মধুর আওয়াজে 'আ' উযু বিল্লাহ্' ও 'বিসমিল্লাহ' পড়িয়া 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' তিন বার এবং কালিমা-এ-শাহাদাত একবার পাঠ করিবে। ইহার পর মাথা এতটুকু ঝুঁকাইবে যেন তাহা বাম হাটু পর্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়ে এবং লা ইলাহা উচ্চারণ করিতে করিতে মাথা বাম হাঁটুর নিকট লইয়া আসিবে। একই দমে তিনবার 'জরব' লাগাইয়া মাথাকে পিঠের দিকে ঝুঁকাইবে এবং ধ্যান করিবে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল কিছুকে আমি পিছনে নিক্ষেপ করিলাম। অতঃপর শ্বাস ছাড়িয়া পূর্ণ শক্তির সহিত দিলে ইল্লাল্লাহ'র 'জরব' লাগাইবে। তখন ধ্যান করিবে হৃদয় আমার আল্লাহ'র ইশক ও মুহব্বতে আপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে। নফীর সময় (লা ইলাহা বলার সময়) চক্ষু খুলিয়া রাখিবে আর ইসবাতের সময় (ইল্লাল্লাহ

বলার সময়– চকষ মুদিয়া লইবে।এইভাবে উক্ত যিকির দুইশত বার করিবে। ইহাকে 'যিকরে চাহার জরবী' বলা হয়। প্রতি দশবার অন্ত অন্তর 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' পাঠ করিবে। এই পথের প্রাথমিক স্তরের যিকিরকারীগণ 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় 'লা মাবুদা, মধ্যম স্তরেরগণ 'লা মাকছুদা' বা 'লা মাতলুবা' এবং পূর্ণতা প্রাপ্তগণ 'লা মওজুদা ও হামা উস্ত (সকল কিছুইে মূলত ঃ তিনি এক আল্লাহ) এই ধ্যান কিরবে। ইহার পর কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া খেয়াল করিবে– মুমিনের অন্তরে সতত আল্লাহ্'র ফায়জের স্রোতধারা প্রাবহিত হইতেছে।

জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, বাম হাঁটুতে শয়তানী, ডান হাঁটুতে নাফসানী, ডান কাঁধে মালাকী (ফেলেশতাগত গণ) আর অন্তরে রাহমানী খাতরা বা খেয়াল বিদ্যমান। সুতরাং বাম হাঁটুর নিকটবর্তী হইতে নাফসানী খাতরা, কাঁধ পর্যন্ত যাইয়া মালাকী খাতরার নফী (অবলুপ্তি) করিবে এবং ইল্লাল্লাহ-এর জরব লাগাইয়া রাহমানী খাতরার (খেয়ালের) ইসবাত করিবে।

মুরীদ যদি আরবী না বুঝে তবে তাহার বোধগম্য ভাষঅয়ই তাহাকে দু'আ-দরূদ এবং যিকির-আযকার শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

নফ ও ইসবাতের দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ প্রতি খাতরা বা খেয়ালের পৃথক পৃথক নফী করিতে গেলে এক ধরনের বাতিনী ও আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতার বাব দেখা দিতে পারে, তাই মুরিদকে নফী-এ-কুল্লী (দারণাসমূহের সার্বিখ অবলুপ্তি) শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহাতে সকল খাতরাত বা অভ্যন্তরীণ ধারণাসমূহের অবলুপ্তি হইতে পারিবে। তাই পরবর্তী যুগের বুযুর্গানকে দেখা যায়, তাঁহার লা ইলাহা-এর মধ্যে লা-এর আওয়াজ ডান কাঁধের দিকে লইয়া যাইয়া পিঠের দিকে একটু ঝুকিয়া 'আল্লাহ ব্যতীত আর সখল কিছুকেই পিছনে ছুঁড়িয়া ফেলিলাম' এই খেয়াল করিয়া পরে সজোরে দিলের উপর ইল্লাল্লার জবর লাগাইয়া যিকিরের আমল করেন। তাঁহার বলেন, নফী ও ইসবাতের প্রথমোক্ত তরীকায় উল্লেখিত খাতরাত ও ধারণাসমূহের কথা এইখানেও মনে মনে খেয়াল রাখিবে।

যাতে খোদার যিকির ব্যতীত অন্যান্য যিকিরসমূহে (যথা যিকিরে জারুব, যিকরে আর্রা) চার জানু হইয়অ এবং এই যিকিরসমূহ ব্যতীত অন্যান্য যিকির পদ্ধতিসমূহে দুই জানু হইয়া বসা উত্তম।

ইসবাতে মুজার্রাদ ঃ যিকিরকারী কমর সোজা রাখিয়া উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখিবে এবং দুই জানু হইয়া বসিবে। মাথা ডান কাঁধের দিকে লইয়া

যাইবে ও দিলের উপর 'ইল্লাল্লাহ্' জরব লাগাইবে। লা ইলাহা বলার সময় لَامَوْجُوْدَ وَلَيْسَ مَعَهٗ غَيْرِىْ (লা মওজুদা ওয়া লাইস মা'আহু গাইরী)- আমি ব্যতীত আল্লাহর সন্নিকটে কেহ নাই)- এই খেয়াল করিবে। এইভাবে একাধারে চারশত বার জরব লাগাএিব। পরে পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে একবার কালিমা-এ-শাহাদাত এবং তিনবার কালিমা এ-তায়্যিবা পড়িয়া কিছুক্ষণ মুরাকাবায় বসিয়া থাকিবে। সুফিয়া এ-কিরামের পরিভাষায় ইহাকে এক জরুরী যিকির বলা হইয়া থাকে।

ইসমে-যাত (আল্লাহ্)-এর যিকির পদ্ধতি

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ- বল আল্লাহ্ এক এবং বাকী সকল কিছু পরিত্যাগ কর-এই বাক্যটির মর্মানুসারে এইভাবে যিকির করিবে যে, প্রথম আল্লাহ শব্দটির শেষ অক্ষর (হু)-কে পেশ (অর্থাৎ আল্লাহু) এবং দ্বিতীয় বারের আল্লাহ শব্দটির শেষ অক্ষরে জযম (অর্থাৎ আল্লাহ্) করিয়া যিকির করিবে। দুই চক্ষু মুদিয়া মাথা ডান কাঁধের দিকে নিয়া আল্লাহর মূল ও গুণসমূহের বিশ্বাস দৃঢ় করিয়অ লতিফায় রূহ (ডান স্তনের নিম্নে অবস্থিত)-এর প্রথমবার আল্লাহ বলার জরব লাগাইবে আর দ্বিতীয় দফার দিলের উপর জরব লাগএিব। এমন ভাবে ছয়শত বার এই যিকির করিবে। সূফীগণের পরিভাষায় এই যিকির যিকরে দুই জরবী নামে প্রসিদ্ধ। ছয়শত বারের মধ্যে প্রতি নয় বার আল্লাহু আল্লাহু বলিয়া দশম বারে (اَللّٰهُ حَاضِرِىْ اللّٰهُ نَاظِرِىْ اَللّٰهُ مَعِىْ) আল্লাহু হাযিরী আল্লাহু নাযিরী, আল্লাহু মায়ী- (আল্লাহ আমার সমক্ষে, আল্লাহ আমাকে নিরীক্ষণ কিরতেছেন, আল্লাহ আমার সঙ্গে)- এই তিনটি কালিমার কোন একটি পাঠ করিবে। ইহার পদ্ধতি হইল, প্রথম দশে 'আল্লাহু হাযিরী, দ্বিতীয় দশে 'আল্লহু নাযিরী' তৃতীয় দশে আল্লাহু মায়ী, এবং পরে প্রতি দশমবারে 'আল্লাহু হাযিরী, আল্লাহু নাযিরী, আল্লাহু মায়ী' উরুজ ও নযুল (আরোহ ও অবরোহ) তরীকায় পাঠ করিবে। এই সকল যিকিরের অর্থও লক্ষ্য করিয়া যাইবে। ইহাতে যিক্কিরের আগ্রহ এবং স্বাদ অনুভূত হইবে। ফলে অলসতা এবং অমনযোগিতার সৃষ্টি হইতে পারিবে না। অতঃপর পূর্বোল্লিখিত তরীখায় কালিমায়ে তায়্যিবা তিনবার, কালিমায়ে শাহাদাত একবার পড়িবে। পরে ডান কাঁধের দিকে মাথা ঝুঁকাইয়া আল্লাহু আল্লাহু- এর জরব একাধারে কয়েকবার লাগএিব। তিনবার কালিমায়ে শাহাদত আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু পড়িয়া এগাবরবার দরূদ শরীফ এবং এগারবার ইস্তেগফার পাঠ করিবে।

পরে ধ্যান ও হুজুরে কালবীর সহিত এই সিলসিলার পীর ও মাশায়েখের রূহের উপর ইসালে সওয়াব করিবে। ইহার পর মন যতক্ষণ চায় মুরাকাবা[১] এবং যে যিকির তাহার ভাল লাগে সকাল পর্যন্ত উহাতে মশগুল থাকিবে। সম্ভব হইলে ফজরের নামাযের পর শায়খের খেদমতে উপস্থিত হইবে। আর তা না হইলে তখন যিকির, শুগল এবং মুরাকাবায় মশগুল থাকিবে[২] অথবা পীর ভাইগণের সহিত যিকরে জেহরী (সরব যিকির) বা তাহাদের সহিত মুরাকাবার হালকায় শামিল হইবে। 'ইল্লাল্লাহ্-এর এর যিকিরের সময় 'ইল্লাল্লাহ' শব্দটি বেশী জোর দিয়া বলিবে। যিকিরের পরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়ইহি ওয়া সাল্লাম, মাশায়েখে তরীকতগণের পবিত্র রূহের উপর ফাতিহা ও ইসালে সওয়াব করিবে।

নফী ও ইসবাত যিকিরের অন্য একটি পদ্ধতি

"নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা বিদ্যমান; আর ঐ টুকরাটির মধ্যে রহিয়াছে কালব কালবের মধ্যে ফুয়াদ, ফুয়াদের মধ্যে রূহ, রূহের মধ্যে সির, সিরের মধ্যে নূর। আর ঐ নূর বা জ্যোতির মধ্যে স্বয়ং আমি বিদ্যামন'- এই প্রবচন অনুসারে সাতটি লতীফা (সূক্ষ্ম রূপ) এর সহিত দিলের গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া নফী ও ইসবাত যিকিরেরও সাতটি পর্যায় স্থির করা হইয়াছে। এই প্রতিটি পর্যায়েই নফী-ইসবাত রহিয়াছে। সুতরাং মৌখিক যিকিরের বেলায়ও (শরীরের সম্পর্ক যাহার সহিত) মুরীদকে এমনভাবে একাগ্র হইতে হইবে। যেন যিকির ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিতে তাহার নিকট না থাকে; আর কোন শ্বাস যেন তাহার যিকির ব্যতীত বাহির না হয়। সালিক-খোদার রাহের যাত্রী যখন এই পর্যায়ে উন্নীত হয় তখন সে বস্তুজগতের জড়ত্ব অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরে যাইয়া উপনীত হয়।

১. সূফীগণের পরিভাষায় মুরাকাবা হইল আল্লাহ ব্যতীত আর সকল কিছুর খেয়াল হইতে কালবকে মুক্ত রাখা এবং অন্য কাহারো প্রতি লক্ষ্য না করা। ইহার আভিধানিক অর্থ হইল মাথা ঝুঁকাইয়া বসা।

২. যিকরে জেহরী করিতে ইচ্ছা না হইলে যিকরে খফী (অনুচ্চভাবে) করিবে। আর ইহাতেও স্বাদ না পাইলে অন্য কোন যিকির করিবে। ইহাতেও যদি সে লুৎফ ও মজা না পায় তবে মুরাকাবায় মুশগুল থাকিবে।

লা-ইলাহার ধ্যান ও ইহার যিকিরে মুরীদকে এমনভাবে মগ্ন হইতে হইবে যে, ইল্লাল্লাহ্‌র মাধ্যমে আল্লাহর ইসবাত (অস্তিত্ব বিশ্বাস) ভিন্ন আর সকল কিছুরই যেন নফী (বিলুপ্তি) হইয়া যায়। সালিক এই পর্যায়ে উন্নীত হইলে 'মারতবায়ে নাফস (নাফসের পর্যায়) অতিক্রম করিয়া' মরতবায়ে দিল বা ধিল ও হৃদয়ের স্তরে যাইয়া উপনীত হয়।

ইল্লাল্লাহ- এর যিকির দিলের যিকির বলিয়া একাগ্র মনে উহার ধ্যান কর কর্তব্য। স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীকে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর সহিত এমনভাবে বিজড়িত করিবে যে, ইল্লাল্লাহ-এর জরবের মাধ্যমে তাহার নফীর ধারণারও যেন বিলুপ্তি হইয় াযায়। সালিক এই মরতবায় উন্নীত হইলে সে দিলের স্তর অতিক্রম করিয়া রূহ ও আত্মার স্তরে যাইয়া উপনীত হয়। রূহের যিকির হইতেছে আল্লাহর ইসমের যিকির। সুতরাং ইসমে যাতের যিকিরে এমনভাবে সালিকের মশগুল হওয়া উচিত اَللّٰهُ (আল্লাহ্) শব্দটির আলিফ ও লাম যেন আর অবশিষ্ট না থাকে বরং 'হু' 'হু' কেবল অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এই স্তরে পৌছার পর সালিকের আপাদমস্তক যিকিরে পরিণত হইয়া যায়। এবং রূহের স্তর অতিক্রম করিয় াসে সিরে-এর স্তরে উপনীত হয়। ইহার পর তাহাকে 'হু' 'হু'- এর যিকিরে এমনভাবে মগ্ন হইতে হইবে যে, সে খোদ নিজেই যেন আল্লাহর মাঝে একাকার হইয়া যায়। সূফীগণের পরিভাষায় 'ফানা দর ফানা' (বিলুপ্তির মাঝেও বিলুপ্তি)-এর অর্থ ইহাই। এই স্তরে পৌছার পর সালিক আপাদমস্তক নূর পরিণত হইয়া পড়ে এবং بِيْ يَسْمَعُ وَبِيْ يَبْصُرُ (আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার এত নিকটবর্তী হইয়া যায় যে, আমার কানেই সে শুনে এভং আমার চোখেই সে দেখে) এই স্তরে যাইয়া সে উপনীত হয়। ইহার পর তাহার নিকট আবদিয়্যত (দাসত্ব) এবং মা'বুদিয়্যত (উপাস্য হওয়ার)-এর হাকীকত এবং সকল তাৎপর্য উদঘাটিত হওয়ার স্তর অর্থাৎ মাকামে আবদিয়্যত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অতি সহজেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। অতঃপর যথাযথবাবে হক আদায় করিয়া ইবাদতসমূহ এবং শরীয়তের হুকুম আহ্‌কাম পালনে তাহাকে সদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে। আর ইরশাদ ও হেদায়েতের মসনদে বসিয়া সত্যান্বেষীদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে থাকিবে। তখন যাইয়া তাহার বিলায়ত[১] এবং মাশিখিয়্যাতের[২] স্বীকৃতি পাইতে পারিবে।

---

১. আল্লাহর মাঝে লীন হইয়া যাওয়া এবং আল্লাহর অস্তিত্বে স্বীয় অস্তিত্ব এবং আল্লাহর প্রকাশে স্বীয় প্রকাশ এই একাত্মতার স্তর অর্জন করার নামই বেলায়েত।

২. বস্তু ও ফেরেশতা জগতের সকল কিছুতেই আল্লাহর হুকুম অনুসারে ব্যবহার ক্ষমতা পাওয়ার নাম হইতেছে মাশিখিয়াত। মাশিখিয়াতের স্তর বেলায়েতের স্তর হইতে উর্ধ্বে।

ফা ঃ মাহবুব ও প্রিয়তমের মিলনে যত বিলম্ব হয় ততই প্রেমিকের আগ্রহের বহ্নিজ্বালা এবং মিলনাকাঙ্খা তীব্রতর হয়। সে ব্যক্তি সাহস ও দৃঢ়তা লইয়া ইহাতে প্রচেষ্টা চলাইয়া যাইবে আল্লাহর অপার মেহেরবানীতে তাহার সফলকাম হওয়ার আশা করা যায়।

পাস আনাফসের[১] প্রথম পদ্ধতি : প্রতি প্রশ্বাসে মানুষকে সজাগ ও সতর্ক থাকা উচিত। পাস আনফাস তরীকার সাহায্য নেওয়া ব্যতীত মানুষের মন আবিলতা ও অন্ধকার হইতে মুক্ত হইতে পারে না। সূফীগণের পরিভাষায় পাস আনফাস হইতেছে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস উভয় সময়ই সরবে হউক বা নীরবে আল্লাহর যিকির করা। শ্বাস গ্রহণ করার সময় কেবল শ্বাসের মাধ্যমে 'ইল্লাল্লাহ' বলিবে আর শ্বাস বাহির করার সময় 'লা ইলাহা' বলিবে। যিকরে সিররী বা নীরব যিকিরের সময় এই পদ্ধতিতে শ্বাসের মাধ্যমে কেবল যিকির করিবে এবং শ্বা গ্রহণ ও বাহির করার কালে নাভির দিকে লক্ষ্য করিবে। মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিবে। জিহ্বাকে সামান্যতমও নাড়াইবে না। এই যিকিরে এত দৃঢ়তা ও নিয়মানবির্তিতা দরকার যে, ইহার মাধ্যমে শ্বাস আপনা হইতেই এরাদা ও ইচ্ছা ব্যতিরেকেই যেন যিকির কারিতে লাগিয়া যায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ শ্বাস বাহির করার সময় 'আল্লাহ' এবং গ্রহণ করার সময় 'হু' শব্দটি ভিতরে টানিবে; আর ধ্যন করিবে জাহির ও বাতিন ভিতর এভং বাহির সর্বত্রই আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ বিরাজমান। এত বেশী করিয়া এই যিকির করিবে যে, শ্বাস আপনা হইতেই যেন যিকিরে অভ্যস্ত হইয়া উঠে; শয়ন ও জাগরণ সর্বাবস্থায়ই যেন সে যাকির (যিকিরকারী) হইয় থাকিতে পারে। পাস আনফাসের মাধ্যমে তাহার অন্তর যেন আবাদ হইয়া থাকে এবং আল্লাহ ব্যতীত আর সকল কিছু হইতে উহা যেন একেবারে নির্মল হইয়া উঠে। এই যিকির কলবকে একেবারে নির্মল এবং সকল প্রকার আবিলতা হইতে বিমুক্ত করিয়া তুলে বলিয়া সুফীগণের পরিভাষায় এই যিকিরকে জারুবে কালব' বা কালব পরিষ্কারক বলা হইয়া থাকে।

ফা ঃ যিকিরকারীর অন্তর যদি একান্ত সাদা হয় এবং যিকিরের স্বাদ সম্পর্কে যদি সে অনবহিত হয় তবে পীর ও মুর্শিদ তাহাকে আদব সহকারে দুই জানু হইয়া বসিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া কোমর বাঁকাইয়া তাহার সীনাকে সামান্য সামনে ----------

১. পাস আনফাস যিকিরের অনেক পদ্ধতি রহিয়াছে। অনেকে প্রতিশ্বাসে শুধু 'আল্লাহু', অনেকে প্রতিশ্বাসে হুয়ায যাহির, হুয়াল বাতিন, ইয়াহায়্যু, ইয়াকায়্যুম, আবার কেহ কেহ 'হক হক', কেহ কেহ 'ইয়া হুয়া', কেহ কেহ কেবল 'হুয়া হুয়া যিকির করিয়া থাকে। এই সকল পদ্ধতিই মূল উদ্দেশ্য (আল্লাহ্‌র সান্নিধ) অর্জন হইতে পারে।

করিয়া বসিতে নির্দেশ দিবেন; অতঃপর মুরীদের শ্বাসের সহিত নিজে ও শ্বাস লইবেন এবং মুর্শিদের শ্বাস বাহির করার সহিত নিজেও শ্বাস বাহির করিবেন। এই পদ্ধতিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই মুর্শিদ আপনা হইতেই চঞ্চল হইয়া উঠিবে। একান্ত আতিশয্যে ধ্বনি দিতে শুরু করিবে এবং মুর্শিদে অন্তরে যে ধরনের যিকির হইবে অনিচ্ছায়ই সে তাহা করিতে থাকিবে।

সরল ও মেধাহীন মুরীদরে দ্বিতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি

মুরীদ যদি মেধার দিক হইতে দুর্বল হয়, কোন যিকির পদ্ধতিই যদি তাহার কলবে কার্যকর না হয় তবে মুর্মিদ তাহাকে তাহার 'ইসবে মুরুব্বী' যিকিরের তা'ৎলীম দিবেন। মুরীদের 'ইসমে মুরব্বী' বাহির করার তরীকা হইল, পীর সাহেব স্বীয় মুরীদিকে নির্জনে সামনে বসাইয়া আল্লহার যেকোন একটি নাম মনে মনে ধারণা করিয়া মুরীদের মনে কয়েকবার উহার জরব লাগাইবেন। কয়েখবার জরব লাগানোর পরও ইহার কোন ক্রিয়া দেখা না গেলে তিনি উহা পরিবর্তন করিয়া আল্লাহর আরেকটি নাম মনে মনে ধরিয়অ লইয়া উল্লেখিতভাবে জরব লাগাইবেন। এইভাবে কোন একটি নামের আছর বা ক্রিয়া তাহার মধ্যে দেখা না যাওয়া পর্যন্ত একটির পর আরেকটি নাম পরিবর্তন করিয়া উল্লেখিত রূপে জরব লাগাইতে থাকিবেন। শেষে তাহার অন্তরে যে নামটির ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইবে উহাই তাহার 'ইসমে মুরব্বী' বলিয়া গণ্য হইবে। এই মুরীদের জন্য ইসমে আজমও উহাই। মুর্শিদ তাহাকে ঐ ইসমটি তনি জরবী বা চার জরবী তরীকায় আদায় করার তা'লীম দিবেন। ইহাতে সে উহার উপর পাবন্দ হইতে পারিবে। এই যিকিরই আল্লাহ চাহেন ত তাহার জন্য উপকারী হইবে এবং উহার মাধ্যমে তাহার অন্তর 'নূরে ইলাহী' দ্বারা আলোকিত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

ইসমে যাত (আল্লাহ)-এর মৌখিক যিকির পদ্ধতির বর্ণনা

পাস আফাস হাযিল হওয়ার পরও এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার কিরয়া প্রত্যহ ইসমে যাতের (আল্লাহ) যিকির করা প্রতিটি সত্যান্বেষীর কর্তব্য। এক লক্ষ পাঁচিশ হাজার বারের সংখ্যাটি হইল চূড়ান্ত পর্যায়ের সংখ্যা। এতটুকু কুলাইতে না পারিলে চব্বিশ হাজার বার উক্ত যিকির করিয়া নিবে। এই সংখ্যাটি হিকমত বা গূঢ় তাৎপর্য হইল, একজন মানুষ প্রত্যহ চব্বিশ হাজার বার শ্বাস প্রশ্বাস নেয়। সুতরাং চব্বিশ হাজার বার যিকির করার দ্বারা প্রতি শ্বাসে একাবর করিয়া যিকির আদায় হইয়া যাইবে এবং কুরআনে উল্লেখিত وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ (এবং যে সকল পুরুষ ও মেয়ে অধিক

সংখ্যায় আল্লাহর যিকির করিয়া থাকে) তাহাদের মধ্যে সেও অন্যতম হইতে পারিবে। এইটুকুও সম্ভব না হইলে অন্ততপক্ষে প্রত্যহ বার হাজার বার ত উক্ত যিকির করিয়াই লওয়া উচিত[১]। এই পদ্ধতিতে যবানী যিকির নিঃসন্দেহের কালবী যিকিরের উসীলা হিসাবে প্রমাণিত হইবে।

যবান ও লব উভয় ভাবেই যখন যিকির হইতে থাকিবে তখন যিকির পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করিবে। যিকিরকে পূর্ণতায় পৌঁছাইতে উল্লেখিত তরবীব ও ক্রমপদ্ধতি সকল সিলসিলা্য়ই লক্ষ্য রাখা হয়। তবে নকশাবন্দিয়া সিলসিলায় কেবল মাত্র যিকরে কারবীর উপরই সীমাবদ্ধ রাখা হয় এবং প্রাথমিক পর্যায়ে মুরীদগণকেও তাহারা এই যিকির দ্বারাই সবক শুরু করান।

জরবসহ ইসমে যাতের যিকির পদ্ধতি ঃ ইসমে যাতের যিকিরের চারিটি পদ্দতি। যিকির এক জরবী, যিকির দুই জরবী, যিকির দুই জরবী, যিকির তিন জরবী এবং যিকির চার জরবী। এক জরবীর নিয়শ হইল, চক্ষু মুদিয়া ডান কাঁধের দিকে মাথা টানিয়া সজোরে দিলের উপর 'আল্লাহ' শব্দের জবর রূহের উপর আর দ্বিতীয় জরব দিলের উপর লাগাইবে। তিন জরবী যিকিরে প্রথম জরব ডান হাঁটুতে, দ্বিতীয় জরব বাম হাঁটুতে এবং তৃতীয় জরব দিলে লাগাইবে। চার জরবীতে প্রথম জরব ডান হুঁটুতে, দ্বিতীয় জরব বাম হাঁটুতে, তৃতীয় জরব রূহের উপর এবং চতুর্থ জরব দিলের উপর লাগাইবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ বসিয়া হউক বা কিবলামুখী হইয়া এক জরবী হইতে শুরু করিয়া সাত জরবী পর্যন্ত যিকির করিবে। এক জরবী এবং দুই জরবী যিকির উল্লেখিত পদ্দতিতে করিবে। তৃতীয় জরবীতে প্রথম জরব বাম দিকে, দ্বিতীয় জরব ডান দিকে, তৃতীয় জরব দিলে লগাইবে। চার জরবীতে ডানে, বামে, সামনে এবং দিলে ক্রমানুসারে জরব লাগএিব। চয় জরবতে ক্রমান্বয়ে ডানে বামে, সামনে পিছনে, উপরে আকাশের দিকে এবং দিল জরব লাগাইবে। সাত জরবীতে ক্রমানুসারে ডানে, বামে, সামনে, পিছনে, নীচে, উপরে এবং দিলে উপর জরব লাগাইবে। প্রতিটি জরাবর সময় فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ (যে দিকেই মুখ ফিাইবে সেই দিকেই আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান) এই ধ্যান করিবে এবং উহাতে নিমগ্ন হইবে। এই যিকিরের যে কি স্বাদ, কি লুতফ তাহা ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নহে। একমাত্র যিকিরকারী ব্যক্তিই উহার প্রকৃত স্বাদ অনুভব করিরে পারেন। উল্লিখিত আয়াতটির মর্মানুসারে ধ্যান করিয়া

---

১. কেহ কেহ কমপক্ষে ছয় হাজার বারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

পরিপূর্ণ একাগ্রতা এং সম্পূর্ণভাবে যদি ইহা করা যায় তবে আত্মবিমোহন ও আত্মবিভোরতার এক অত্যাশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং প্রতিটি বস্তুর যিকিরের আওয়াজ সে তখন শুনিতে পায় اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ (প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর হামদ ও তাসবীহ করে) কুরআনে করীমের এই আয়াতটির পরিপূর্ণ সমর্থন তখন উপলব্ধ হইয়া উঠে।

চার জরবী যিকিরের দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ কুরআন শরীফ বা কোন বুযুর্গের কবর সামনে রাখিয়া কিবলামুকী হইয়া এবং প্রথম ডান দিকে, পরে বাম দিকে, ইহার পর কুরআন শরীফ বা কবরের উপর এবং চতুর্থবার কলবের উপর জরব লাগবি। এই যিকিরের মাধ্যম তাহার নিকট কুরআনে করীমের মর্ম এবং কাশফে কুবুর বা কপরের সকল অবস্থা উদঘাটিত হইয়া উঠিবে।

ইসমে যাত কলন্দরী পদ্ধতি ঃ সালিক এবং আল্লাহর পথের যাত্রী যদি মাকমে হুয়াইয়াত-এ পৌঁছিতে চায় তবে সর্বদা তাহার এই যিকির করা উচিত এবং সর্বদা তাহার নির্জনতা অবলম্বন করা কর্তব্য। নির্জনে চার জানু হইয়া বসিবে। উভয় হাঁটুর মাঝখানে মাথা নত করিয়া নাভির উপর 'আল্লাহ্'-এর জরব লাগয়িা মাতা উঁচু করিবে এবং উভয় হাঁটু দৃঢ়ভাবে ধারণা করিয়া দিলের উপর 'হু'-এর জরব লাগাইবে। এইভাবে যিকির মশগুল থাকিতে পারিলে আল্লহা পাকের গুণসমূহ বহুলাংশে তাহার মধ্যে রূপায়ত হইয়া উঠিবে। অধিকাংশ মাশায়িখের নিকটই এই যিকির দৈনন্দিন কার্যসূচী হিসাব ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে।

যিকিরে জারুবের পদ্ধতি ঃ বাম হাঁটু হইতে 'লা ইলাহা' শুরু করিয়া মাথা ডান হাঁটুর দিকে টানিয়া ডান কাঁধের দিকে লইয়া যাইবে এবং কবরের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়া খুব জোরে দিলের উপর ইল্লাল্লাহ এর জরব লাগইবে। যিকিরে দুই জানু হইয়া বসা উচিত।

যিকরে হাদ্দাদীর পদ্ধতি ঃ উল্লিখিত নিয়মে সজোরে শ্বাস টানিয়া 'লা ইলাহা' বলিয়া ডান কাঁধ পর্যন্ত নিয়া দাঁড়াইয়া পড়িবে এবং দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া সশক্তিতে দিলের উপর ইল্লাল্লাহর জরব লাগাইবে ও বসিয়া পড়িবে। হাতুড়ি উঠানোর সময় কর্মকার যেমন তাহার হাত উঠায় ও নামায় সেও হাত দুইটি তদনুরূপবাবে উঠাইবে এবং নামাইবে। ইহাতে ইহার প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করিতে পারিবে। হযরত মায়খ জালাল থানেশ্বরী সম্পর্কে ইমাম আবুল হাফেছ উল্লেক করিয়াছেন যে, তিনি বলিতেন- আমার শায়খ আমাকে বড় প্রিয় এই যিকিরের তালীম দিয়াছিলেন, এই যিকির সাধারণ শক্তির বাহিরে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে ইহা খুবই সহজ হইয়া আসে।

যিকরে আর্রার-পদ্ধতি ঃ উলটা শ্বাস টানিয়া সশক্তিতে 'লা ইলাহ' বলিয়া কাঁধ পর্যন্ত মাথা নিয়া পঠেপর দিকে সামান্য ঝুঁকাইয়া দিলের উপর 'ইল্লাল্লাহ'- এর জরব লাগাইবে।

যিকরে আর্রার দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ চক্ষু মুদিয়া জিহ্বা তালুর সহিত লাগ্য়িা উল্টা শ্বাস নিয়া সশক্তিতে 'আল্লাহ' শব্দটি নাভি হইতে টানিয়া ডান কাঁধের দিকে নিয়া 'হু' শব্দটির মাধ্যমে কাঠ মিস্ত্রী যেকাবে করাত চালায় সেই ভাবে দিলে জরব লাগাইব। ইহাতে শ্বাস বাকী রাখিবে, ছাড়িয়া দিবে না এবং আল্লাহ তা'আলার সিফাত ও গুণাবলীর মাধ্যমে দিকসমূহের ধ্যান করিবে[১]। আমি আমার মনের উপর করাত চালনা করিতেছি-যিকিরের সময় এই খয়াল করিবে। ভাবিবে, করাত দিয়া কাঠ চিরার সময় যেমন অনেক গুড়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে আমার দিল হইতেও নূরের কণাসমূহ বাহির হইয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং শরীরের সীমানা অতিক্রম করিয়া আমাকে এবং সমস্ত জগতকে আচ্ছাদিত করিয়া নিতেছে। এই যিকিরে এমনভাবে নিমগ্ন হওয়া উচিত যেন পরিপূর্ণ বিমোহন ও মুশাহাদার সম্পদ সে অর্জন করিয়া নিতে পারে। এই যিকিরের কি স্বাদ তাহা একমাত্র যাকির বা যিকিরকী ব্যক্তিই অনুভব করিতে পারে; ভাষায় তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ফা ঃ জেহরী যিকিরের (যে যিকির বুরন্দ আওয়াজে করা হয়) বেলায় আহার এত কম করা উচিত নহে যে, স্বাস্থ্য দুর্বল হইয়া পড়ে বা ভাঙ্গিয়া পড়ে। পেটের চারি ভাগের এক ভাগ খাল রাখিলেই হইবে। আহারে তৈল ও মগজ জাতীয় বস্তু ব্যবহার করা উচিত) ইহাতে মস্তিস্ক শুষ্ক হইয়া কষ্ট পাওয়ার আশংকা থাকিবে না।

সুলুকের পথে সবচাইতে জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল মুহব্বত ও আস্থার সহিত শায়খ ও মুর্শিদের সহিত প্রাণের সম্পর্ক রাখা। উল্লিখিত যিকিরসমূহের আসল বিষয় হইতেছে যিকিরে দাওয়ামী অর্জন করা।

অর্থাৎ মুরীদ সর্বদা নিজেকে যিকিরকারী হিসাবে ব্যস্ত রাখিবে। দুনিয়ার কাজ কারবার হইতে নিজেকে সম্পর্কহীণ রাখিবে। লোক দেখানো রধারণা হইতেও নিজেকে সর্বদা মুক্ত রাখিবে। ইহাতে এই যিকিরের মাধ্যমে তাহার রূহ ও দিলে সজীবতা আসিবে এবং তখন উহা প্রাণের দোসর হিসাবে পরিগণিত হইবে। কবি বলেনঃ কথা নহে কাজ কর

এই পথে কেবলমাত্র প্রয়োজন কাজেরই।

---

১. আল্লাহর এই গুনসমূহ হইতেছে ইলম (জ্ঞান), কুদরত (শক্তি), হায়াত (জীবন), সামা (শ্রবণ), বছর (দৃষ্টি), ইরাদা (ইচ্ছা), তাকবীন (সৃষ্টি করা), কালাম (কথন)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যিকিরের শুগল ও ওজীফাসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা

দিলের মধ্যে দুইটি ছিদ্র বিদ্যমান। একটি নীচের দিকে। ইহার সম্পর্ক রূহের সাহিত। অপর ছিদ্রটি হইতেছে উপরের দিকে। যিকিরকারী যখন সফলভাবে যিকিরে লিপ্ত হয় তখন দিলের ঐ উপরের দরজাটি খুলিয়া যায় নীচের দরজাটি শুধূ যিকরে-খফীর (হাবসে দম বা শ্বাস বন্ধ করিয়া যিকির করা) সাহায্যেই খোলা সম্ভব হয় যিকিরসমূহের মধ্যে মূল হইতেছে এই হাবসে দম। চিশ্তীয়া ও কাদরিয়া তরীকার বুযুর্গগণ যিকিরের মদ্যে ইহাকে শর্ত হিসাবে র্বণনা করিয়াছেন। নকশবন্দিয়া তরীকার শায়খগণ ইহাকে থর্ম হিসাবে ঘোষণা না করিলেও উহার মর্যদাা ও প্রাধান্যকে তাঁহারও অস্বীকার করেন নাই। ইহার বহু উপকারিতার মধ্যে একটি হইল ইহাতে ভিতরের উষ্ণতা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং চবি ও অতিরিক্ত মেদ কমিয়া আসে। কলবের সহিত যে সমস্ত রগ মিশিয়া রহিয়াছে এইগুলি চবিদার হইয়া থাকে। এই চবিকে বাহন বানাইয়া শয়তান মানুষের দিল বিভিন্ন ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করে। শ্বাস বন্ধ করার মাধ্যমে উহার উষ্ণতায় চবি গলিয়া গিয়া দিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। ফলে শয়তানের যাবতীয় প্রচেষ্টা তখন ব্যর্থ হইয়া যায়।

যিকিরের শুগল ও ওজীফাসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা

শয়তান আযদাহা সাপের মত। ইহার ফণা অতি বিষাক্ত এবং সুচাল্ মুরীদ যখন গুনায় লিপ্ত হয় বা হারাম খাদ্য আহার করে তখন ইহার শক্তি আরো বৃদ্ধি পায় এবং সে তাহার ফণাটি দিলের চুতষ্পর্শ্ব ঘুরাইতে থাকে। ইহাতে উহার বিষক্রিয়া কলবের মধ্যে যাইয়া প্রভাব বিস্তার করে। ফলে কলবে অন্ধকার এবং কারিমা সৃষ্টি হয়। আর মুরীদ যখন সকল গুনাহ হইতে তওবা করিয়া পাস-আনফাস যিকিরে মশগুল হয়, তখন শয়তান দুর্বল হইয়া পড়ে এবং কালবে নূর এবং ছাফায়ী ও পরিচ্ছন্নতার সৃষ্টি হয়।

ফা ঃ কোন মন্দ খেয়াল দি দিরে মজবুত হইয়া বসে আর কোন ক্রমেই উহা দূরীভূত না হয় তবে উহা দূর করার উপায় হইল, শ্বাস নাভি হইতে টানিয়া কালবে আনিয়া থামিবে এবং দিল হইতে কারিমা 'লা ইলাহা' বাহির করিবে। ধারণা করিবে, দিলের উপর বসা আযদাহারূপী শয়তানের লেজ আমি এই 'লা ইলাহা'- এর কাঁচি দ্বারা ধরিলাম। অতঃপর সে ডান কাঁধ পর্যন্ত ঐ শ্বাস টানিয়া নিবে এবং দিলের উপর সজোরে 'ইল্লাল্লাহ'-এর জরব লাগাইবে। খেয়াল করিবে, এই মার শয়তানের মাথায় মারিয়া ইহার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিলাম এবং ইহা আমার দিল হইতে এখন বাহির হইয়া গিয়াছে। বিরামহীনভাবে একের পর এক এই ধরনের জরব লাগাইতে থাকিবে। খোদা চাহেন ত অতি সত্বর ফাসিদ এবং বদখেয়ালসমূহ বিদূরিত হইয়া যাইবে। শয়তানও বিতাড়িত হইয়া যাইবে। মন যিকিরের নূরে আলোকি হইয়া উঠবে।

এই যিকিরের সময় হাসবে দম ও খবিই সতর্ক লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। হাবসে দম ব্যতীত এই যিকির উপকার যে করে না তাহা নয়, তবে হাবসে দম থাকা ইহার একটি শর্ত।

হাবসে নফী ও ইসবাত পদ্ধতি ঃ এই যিকিরকে অনেকেই শুগলে নফী ও ইসবাত বলিয়া থাকেন। ইহার তরীকা হইল, চক্ষু মুদিয়া জিহ্বাকে তালুর সহিত লাগইয়া নাভিমূল হইতে শ্বাস টানিয়া দিলের কাছে আনিবে এভং 'লা ইলাহা, শব্দটি বাম হাঁটুর নিকট হইতে ডান হাঁটুর দিকে টানিয়া কাঁধ পর্যন্ত ফাইয়া দিলের উপর সজোরে ইল্লাল্লাহর জরব লাগইবে। প্রথম দিন দশ শ্বাস লইবে এবং প্রতি শ্বাসে তিনবার করিয়া ঐরূপ করিবে। ইহার পর প্রতিদিন এক এক শ্বাস করিয়া বাড়াইতে থাকিবে। আল্লাহ্ বেজোড়। সুতরাং তিনি বেজোড় সংখ্যা পছন্দ করেন- বৃদ্ধি করার সময় উক্ত নীতিটির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। ইহাতে ভিতরে উষ্ণতার সৃষ্টি হইবে এবং চর্বি গরিয়া যাইবে। ফলে শয়তানী আশংকা ও ওয়াসওয়াসাসমূহ বিদূরিত হইবে এবং শয়তানও পরাজিত হইবে।

শ্বাস টানিয়া এই ধরনের যিকিরের অভ্যাস যখন হইবে তখন মনের মাঝে বিশেষ এক আত্মবিমোহনতার সৃষ্টি হইতে দেখা যাইবে। ইলাহী ইশক ও মহব্বতের আগুনে তাহার সবকিছু আলোকিত হইয়া উঠিবে। তবে ওয়াসওয়াসাসমূহের বিদূরণ এবং হাবসে- মের এই অনুশীলনে উদর খালি রাখা একান্ত জরুরী। প্রাথমিক অবস্থায় তো ইহার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী।

ফা ঃ হাবসে-দম যিকিরের সময় ঠাণ্ডা এবং শীত হইতে খুবই বাঁচিয়া থাকা উচিত। ঠাণ্ডা পানি, বাতাস ইত্যাদি ব্যবহার করা হইতে তখন বিরত থাকা আবশ্যক। কেননা শীতলতার প্রবাবে কলবের উষ্ণতা বিদূরিত হইয়া যাওয়ার কুবই আশংকা রহিয়াছে। অসুস্থতা ও স্বাস্থ্যহীনতার আশংকা বিদ্যমান থাকায় গরম জিনিস ব্যবহারকরা হইতেও দূরে থাকা কর্তব্য। এত বেমী আহার করিবে না যে শরীর অলস ও ভারী হইয়া পড়ে এবং এত কমও আহার করিবে না, যদ্দরুন শরীর দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে।

হাবসে নফী ও ইসবাতের দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ একান্ত নির্জনে চার জানু হইয়া বসিয়া চক্ষু মুদিয়া লইবে। ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং ইহার পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলীর সাহায্যে হাঁটুস্থিত কীমাস নামক রগটি চাপিয়া ধরিয়া হাত হাঁটুর উপর রাখিবে। অতঃপর নাবিমূর হইতে শ্বাস টানিয়া দিলের দিকে লইয়া আসিবে এবং উম্মুদ্মিাগ অথ্যাৎ মসিএষ্কর কেন্দ্রস্থলে কিছু অভস্থান করার পর জিহ্বা না নাড়াইয়া ধ্যান সহকারে 'লা' শব্দটি নাভি হইতে টানিয়া রূহ পর্যন্ত নিয়া এবং 'ইলাহাৎ'' শব্দটি মস্তিষ্কে পৌছাইয়া পুনরায় বাহির করিবে আর দিলে ইল্লাল্লার জরব লাগএিব। এমনিভাবে একই শ্বাসে পাঁচবার বা সাতবার করিয়া ইহা করিবে এবং পে রধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিবে। প্রত্যেকবার শ্বাস বাহির করার সময় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ) এ্ কতার ধ্যান করিবে এভং চক্ষু খুলিয়া লা মাহবুবু ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বন্ধু নাই)- এর ধ্যান করিবে। পুনরায় শ্বাস লওয়ার সময় চক্ষু মুদিয়া নিবে এবং লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছুর মূলতঃ অস্তিত্ব নাই)–এই ধ্যান করিবে। পরে ধীরে ধীরে শশ্বাস ত্যাগ করিবে। এই ভাবে দিনে শদবার শ্বাস টানিবে এভং পরে প্রতি-শ্বাসে একবার করিয়া উহা বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, যাহাতে ক্রমে সে এক শ্বাসে একশত একুশবার করিয়া উক্ত যিকির করিতে পারে। এই পর্যায়ে পৌছিতে পারিলে তাহার কলবের দ্বার খুলিয়া যাইবে এভং নূরে মুশাহাদার (পরমতমকে সমক্ষে প্রত্যক্ষ করা) আলোকে তাহার হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিবে।

শুগলে সেপায়র চিশ্তীয়া পদ্ধতি ঃ اَللّٰهُ سَمِيْعٌ (আল্লাহ সামিয়ুন-আল্লাহ সর্ব শ্রোতা), اَللّٰهُ بَصِيْرٌ (আল্লাহ বাসীরুন-আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা) اَللّٰهُ عَلِيْمٌ (আল্লাহু আলীমুন-আল্লাহ সর্বজ্ঞানী) এই ইসিমসমূহের যিকিরকে শুগলে সেপায়া বলা হয়। অধিকাংশ পীর-মাশায়িখ এই যিকির

সেপায়া বলা হয়। অধিকাংশ পীর-মাশায়িখ এই যিকির করিয়া থাকনে। ইহা করার তরীকা হইল, চার জানু হইয়া বসিয়া 'সুলতানান নাসীরা' (আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী মহা রাজাধিরাজ)- এর মন ধ্যান করিবে। পরে শ্বাস লইয়া নাভি হইতে উম্মুদ্দিমাগ বা মূল মস্তিষ্কে টানিয়া নিবে এবং আল্লাহ সামীয়ুন বলিবে আর "বী ইয়াসমাউ" (আমার মাধ্যমে তিনি শুনেন)- এই ধ্যান করিবে। পুনরায় নাভিতে শ্বাস নিয়া আল্লাহ আলীমুন (আল্লাহ সর্বজ্ঞানী) এই যিকির করিয়া "বী ইয়ানতিকু" (আমার মাধ্যমেই তিনি কথন করেন) এই ধ্যান করিবে। অতঃপর পুনরায় শরু করিয়া উম্মুদ্দিমাগ বা মস্তিষ্কের মূলে "আল্লাহু আলীমুন" এবং নাভিতে "আল্লাহু সামিয়ূন"-এর জরব উরুজ ও নুযুল (আরোহ ও অবরোহ) পদ্ধতিতে লাগাতিত থাকিবে যেন, এক শ্বাসে একশত একবার শুগলে সেপায়া করার অভ্যাস তাহার হইয়া যায়। ইহা করিতে পারিলে সে জামালে ইলাহী ও ঐশী সৌন্দর্যরাজিবীতে অভিসিক্ত হইতে পারিবে। এই শুগলে আটটি বিষয়ের ধ্যান করিতে হয় বলিয়া শাত্তারিয়াগণ ইহাকে 'হাশত রুকনী' নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

এই শুগল আদায় করার দ্বারা যে ধরনের হাল যিকিরকারীর নিকট উদঘাটিত হয় তাহা বর্ণনা করা অবশ্য আদব বিরুদ্ধ। তবে ইহার তিনটি হাল হইল মৌলিক। এক-নফল ইবাদসমূহের প্রতি নৈকট্য। দুই-ফরয ইবাদত সমূহের প্রতি নৈকট্য। তিন-ফরয বা নফল ইবাদসমূহের নৈকট্য নহে বরং এই অবস্তায় সারিক বা খোদাপথ যাত্রী বুঝিতে পারে যে, তৎকর্তৃক কোন কিছুর নির্ধারণই খোদ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণ।

ফাৎকুরব বা নৈকট্য দুই প্রকার ঃ কুরবে-নাওয়াফেল ও কুরবে ফারায়েয। কুরবে নাওয়াফেলের অর্থ হইল, মানবিক গুণসমূহ অবলুপ্ত হইয়া সালিক বা খোদা অন্বেষী ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী ও শক্তির সৃষ্টি হওয়া। যেমন- 'কুম বি ইযনিল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি উঠিয়া দাঁড়াও) বলিয়া মুর্দাকে জীবিত করা এবং পুরে আবার ইহাকে মেরে ফেলা (কোন যন্ত্রের মাধ্যম ব্যতিরেকে), দূরের কথা শোনা বা দূরের জিনিস দেখা ইত্যাদি।

কুরবে ফারায়েযের অর্ত হইল, আল্লাহ ব্যতীত আর সকল কিছুর অস্তিত্বের উপলব্ধি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়া এবং সালিকের অন্তরে আল্লাহর অস্তিত্ব ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্বের ধ্যান না থাকা। সুফীগণের পরিভাষায় ফানা ফিল্লাহ' কথাটির মর্ম ইহাই। আর ইহাই হইতেছে কুরবে ফারায়েযের ফল।

সুলতানান নাসীরা শুগল পদ্ধতি ঃ হযরত খাজা মুইনউদ্দীন চিশ্‌তী (র) হইতে বর্ণিত আচে যে, তিনি বলিয়াছেন, এই শুগল পদ্ধতির বহু উপকারিতা রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া খাতারাত ও মনের শয়তানী খেয়ালসমূহ বিদূরণের ব্যাপারে এই যিকিরের আশ্চর্য তাছীর দেখা যায়। এই শুগল আদায়ের পদ্দতি হইল, সকালে এবং বিকালে কিবলামুখী হইয়া দুই জানু হইয়া বসিবে। সুস্থির মনে উভয় চক্ষু বন্ধ করিয়া বা একচক্ষু দুই জানু হইয়া বসিবে। সুস্থির মনে উভয় চক্ষু বন্ধ করিয়া বা একচক্ষু বন্ধ করিয়া ও অপর চক্ষুর দৃষ্টি নাকের ডগায় স্থাপন করিবে এবং নিষ্ফলকভাবে বাতি বা তারার আলো দেকার মত অনির্দিষ্ট একটি ঐশী আলোর ধ্যান করিবে। ধ্যানে এতদূর নিমগ্ন হইয়া থাকিবে যে, সম্পূর্ণভাবে ইহাতেই যেন যেস আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। প্রথম প্রথম এই পদ্ধতিতে চক্ষুর কষ্ট হইব বটে, পানিও হয়ত ঝরিতে থাকিবে তবে কিছুদিন পর অ্যভাস হইয়া গেলে আর এই কষ্ট অনুভব হইবে না। আয়নার মাঝে যেমন নিজের চেহারা স্পষ্ট দেখা যায় তেমনি সে তখন নিজেকে অবলোকন করিতে পারিবে এবং নূরে ইলাহীর উজ্জ্বল প্রভায় সে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। আর তদনুসারেই সে স্বাদ উপলব্ধি করিতে পারিবে।

সুলতানাম মাহমুদা শুগল পদ্ধতি ঃ 'সুলতানান নাসীরা' পদ্ধতিতে নাকের ডগার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয় আর এই পদ্ধতিতে ভ্রুর মাঝে দৃষ্টি নিবন্ধ করাতে হয়। এই শুগলের ফল হইল, ইহার মাধ্যমে যিকিরকারী ব্যক্তির সামনে স্বীয় গোপন ভেদ উন্মোচিত হইয়া উঠে, আর যখন নিজের ভেদ উন্মোচিত হইয়া উঠে তখন ক্রমে ঊর্ধ্ব জগতেরও সকল অবস্থা সম্পর্কে সে অবগত হইতে পারে।

সুলতানুল আযকার শুগল পদ্ধতি ঃ সংকীর্ণ এবং অন্ধকার এমন একটি ক্ষুদ্র কুঠরী নির্বাচন করিবে, যেখানে বাহিরের শোরগোলের আওয়াজ প্রবেশ করিতে না পারে। পরে রদরূদ, ইস্তগফার এবং আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর একাগ্রচিত্তে তিনবার

اَللّٰهُ اَعْطِنِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا وَّاعْظِمْ لِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ نُوْرًا

(আলআহু 'আতিনী নূরাওঁ ওয়াজ আল লী নূরাওঁ ওয়াযামলী নূরাওঁ ওয়াজ আলনী নূরা-আল্লাহ আমাকে নূর দিন, আমার জন্য নূর দিন, নূর আমার বড় করিয়া দিন, আমার সম্পূর্ণ সত্তাকে আপনি নূর বাআয়িা দিন।) এই দু'আ পাঠ করিবে। ইহার পর শুইয়া বা বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিয়া সম্পূর্ণ

শরীর ঢিলা ও আঁসাড় কিরয়া রাখিবে এবং নিজেকে মৃত বলিয়া ধ্যান করিবে। পরে আপাদমস্তক ধ্যানস্থ হইয়া শ্বাস গ্রহণের সময় 'আল্লাহ' এবং শ্বাস ত্যাগে রসময় 'হু' বলার ধ্যনা করিবে। শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগের সময় প্রতিটি লোমকূপ হইতে 'হু'-এর যিকির হইতেছে বলিয়া খেয়াল করিবে। ইহাতে এমনভাবে সে নিজেকে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে যেন স্বীয় অস্তিত্বও তাহার নিকট বিলুপ্ত হইয়া যায়। 'হুওয়াল হায়্যুল কায়্যুম' (তিনি চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী) সতত এই খেয়াল ও ধ্যান নিজের মধ্যে জাগজক রাখিবে। ইহার ফলশ্রুতিতে কিছুদিনের মধ্যেই তাহার এমন অবস্থা হইবে যে, প্রতিটি চুল এবং লোমকে সব সময় যিকির করিতে দেখা যাইবে এবং তাহার সর্বাঙ্গ আল্লাহর তাজাল্লীর নূরে সমুজ্জল হইয়া উঠিবে।

সুলতানুল আযকার যিকির পদ্ধতি ঃ পঞ্জেন্দ্রিয় (যথা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকতা, ত্বক) তুলা বা অঙ্গুলীর সাহায্যে বন্ধ কিরয়া নাভির তল হইতে শ্বাস টানিয়া উম্মুদিমাগ অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে লইয়া গিয়া থামিবে এবং সেখান হইতে দিলের মাঝে টানিয়া লইয়া কালবী যিকির সহ বস্তু উপাদানে গঠিত মনের কথন শ্রবণের সহিত উম্মুদিমাগে এবং দিলে মুদাওয়ারে[১] অবস্থিত উজ্জ্বল নুকতাটিকে অনেকে 'লতীফা-এ-আখফ (অধিক গোপন লতিফা) নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। উক্ত যিকিরে এমন ভাবে মশগুল হইয়া থাকিবে যেন ক্রমে ঐ নুক্তাটি বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর হইতে থাকে আর তাহার সমস্ত শরীর ইহার প্রবায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহার পর আল্লহার আরশ হইতে হীন এই পৃথবী পর্যন্ত সকল কিছুই নূরে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিবে এবং এই নূরের মাধ্যমে আল্লাহ ও ফেরেশতাগণেরও সুরত দৃশ্যমান হইয়া উঠিবে।

সালিক বা আল্লাহর অন্বেষী ব্যক্তি যদি এই স্তর ও পদ্ধতি অর্জন করিতে পারে তবে সে স্বীয় সত্তাকে নিখিল বিশ্বের নিয়ন্তা বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। এই স্তরের সালিককে স্বীয় গুণসমূহকে আল্লাহরই গুণ বলিয়া ভাবিতে হইবে। যাহাকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন অদৃশ্য সম্মানে বিভূষিত করিয়া থাকেন।

শুগলে সারমদী পদ্ধতি ঃ উল্লিখিত পদ্ধতিতে চক্ষু এবং কর্ণ অঙ্গুলির সাহায্যে বন্দ করিয়া লইবে। অতঃপর ইন্দ্রীয়সমূহ একাগ্র করিয়া ভাবিবে মাথার উপর হইতে বৃষ্টি পড়ার সুর ভাসিয়া আসিতেছে বা এই সুর শুনার প্রতি একান্তভাবে ধ্যানস্থ হইয়া থাকিবে। জনৈক কবি বলিয়াছেন ঃ

---

১. শুগলা বিসাতের র্বণনায় ইহার সংজ্ঞা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভালবাসার পথে অহেতুক আশংকা
শয়তানী খেয়াল বৈ কিছুই নহে।
হুশিয়ার, হৃদয়ের কোন পরমজনের
পয়গামের প্রতি নিবন্ধ রাখ।

মুহূর্তের জন্যও যেন ঐ ধ্যান হইতে সে উদাসীন না থাকে। কিছু দিনের মধ্যেই ঐ সুর এত জোরাল হইয়া উঠিব যে, কান বন্ধ না করিয়াও সে ঐ সুর শুনিতে পাইবে; কোন শোরগোলের শব্দ ঐ সুর শনিত বাধা হইয়া দাঁড়াইবে না। সমস্ত শরীরে যখন এই যিকিরের বিস্তার ঘরে তখন সর্বাঙ্গ হইতে মিনারের গম্বুজের মত ভারি এবং সুরেলা এক আওয়াজ শুনা যাইতে থাকে। সুফীগণের পরিভাষায় এই আওয়াজকে 'ছওতুন আহান' ও 'হামস' বলা হইয়া থাকে। কুরআনে করীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَاتَسْمَعُ اِلَّا حَمْسًا দয়াময়ের উদ্দেশ্যে আওয়াজ কোমল হইয়া গিয়াছে। অনন্তর (হামস) কোমল আওয়াজ ভিন্ন আর কিছুই তোমরা মুন না।

কেহ কেহ বলেন, কুহেতুরে হযরত মূসা বৃক্ষ মধ্য হইতে এই আওয়াজই সমস্ত শরীরের অনুভূতিতে শুনিতে পাইয়াছিলেন। এই আওয়াজই তাঁহার উপর ওহী অবথীর্ণ হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ ছিল্ ওলীগণ এই আওয়াজের মাধ্যমেই 'ইলহাম'-এর গৌরব অর্জন করিয়া থাকেন। আরিফগণ-আল্লাহ সম্যক পরিচয় লাভকারী বুযুর্গগণ এই আওয়াজের মাধ্যমেই পরম সত্যের মিলন পুলকে বিভোর হইয়াছেন। নিয়মিত এই যিকির উক্ত আওয়াজ ক্রমে শক্তিশালী হইয়া এঠ এবং কখনো ঘণ্টাধ্বনির মত আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। কবি হাফিজ বলেন ঃ

কেহ জানে না পরম বন্ধুর কোথায় আবাস
কখনো কেবল ঘণ্টধ্বনি শুনতে পাই।

আবার অনেক সময় অন্যান্য ধরনের আওয়াজও শুনিতে পাওয়া যায়। এই যিকির যখন পূর্ণতায় যাইয়া পৌঁছায় তখনই উহাকে সুলতানুল আযকার বলা হয়। আর মেঘ গর্জন, কখনো বা বজ্রধ্বনির মত সশব্দ আওয়াজ হইতে থাকে। সালিকের সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে। আত্মবিমোহন ও আত্মবিস্মৃতির এক অবস্থা তাহার মধ্যে সৃষ্টি হইয়া যায়। কখনো বা চন্দ্র-সূর্য এবং বিদ্যুত প্রভার আলোর ঝলকানি তাহার সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তবে এইসব ধরনের নূর ও আনওয়ারের প্রতি লক্ষ্য করা সালিকের জন্য উচিত নহে বরং সর্বাবস্থায়ই যেন সে কেবল মাত্র নূরে যাত বা আল্লাহ তা'আলার একক সত্তার জ্যোতির প্রতিই স্বীয় মোনযোগ নিবদ্ধ করিয়া রাখে।[১]

শুগলে বিসাত পদ্ধতি ঃ উম্মুদ্দিমাগ বা মস্তিষ্কের মধ্যে সূর্যের মত উজ্জ্বল একটি দাগ বিদ্যমান। ইহাকে দিলে মুদাওয়ার বলা হয়। সুফীগণের পরিভাষায় ইহার নাম 'সিররে আখফা'। বলা হয় যে, হযরত খাজা মুইন উদ্দিন চিশ্‌তী (রহ) সরাসরি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে এই শুগল পদ্ধতি পাইয়াছিরেন। আর এই শুগলের বরকতেই তিনি বাতেনী ও রূহানী মিরাজের সম্মান অর্জন করিতে পারিয়াচিলেন। এই শুগল পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া বলা হয় ঃ اَلْعِلْمُ نُقْطَةٌ অর্থাৎ জ্ঞান একটি নুকতা বা চিহ্নের নাম। এ্ শুগল আদায় করার তরীকা হইল, চক্ষু বন্ধ করিয়অ, জিহ্বা তালুতে লাগাইয়া, উম্মুদ্দিমাগে শ্বাস গতিরুদ্ধ করিয়া 'হু' 'হু' গুদাকে কিছুটা লাল মিশ্রিত সুরমা (ছাই) রংগের সূর্যের মত ধ্যান কিরবে। মনে করিবে, সমস্ত শরীরেই যেন ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে্ ভং শরীরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া সারাটা শরীরই যেন তাহার 'হু' গুর্দায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই মরতবায়ে ফানা বা বিলুপ্তি স্তরের নাম তাজাল্লী-এ যাত (সাত্তার জ্যোতি) দর্শন বা লাহুতে মুহাম্মদী! এই শুগল আদায়কালে যদি হলুদ নূর দেখা যায় তবে উহা মালাকুতী নূর, যদি সবুজ দেখা যা য়তবে উহা জাবারুতী নূর,, আর কালো দেখা গেলে উহা লাহুতী নূর। আল্লাহ যাহাকে মর্জি করেন তাহাকে তিনি এই অনুগ্রহে বিভূষিত করিয়া থাকেন।

---

১. সূফীগণের পরিভাষায় এই স্তরকে 'মাকাকে কাশাকশ' বলা হয়! এই স্তরে উন্নীত হইরে সালিক দুনিয়ার যাবতী 'কাশাকশ' বা আকর্ষণ হইতে মুক্ত হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ
আনওয়ারাত (ঐশী জ্যোতিমালা) ও মুরাকাবাসমূহের বর্ণনা
যেগুলি যিকির ও ধ্যানের সময় প্রকাশ পাইয়া থাকে

মুরাকাবা পদ্ধতি ঃ সালিক যখন জাহেরী ও বাতেনী, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল ধরনের নূরে সমুজ্জল হইয়া উঠে এবং তাহার শিরা-উপশিরায় যিকিরের প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে তখন তাহার মধ্যে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিমোহনের এক দশার সৃষ্টি হয়। আর এই সময়ই তাহাকে মুরাকাব ও ধ্যান পদ্দতির প্রশিক্ষন দেওয়ার প্রকৃষ্ট সময়।

মুরাকাবা কয়েক প্রকার। তালিব বা খোদা প্রত্যাশী ব্যক্তি যে পদ্দতিতে উপকার পায় এবং যে পদ্ধতি গ্রহণ করিলে সে শীঘ্র মনজিলে মাকসুদ ও অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সক্ষম হইতে পারে, সে পদ্ধতি অনুসারেই হার কাজে লাগিয়া যাওয়া উচিত। মুরাকাবার কতিপয় পদ্ধতির বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম পদ্ধতি ঃ নামাজের তাশহ্হুদের মধ্যে যেভাবে বসে সেইভাবে দুই জানু হইয়া বসিয়া দুই হাঁটুতে মাথা ঠেকাইয়া আল্লাহ ভিন্ন অন্য সব কিছু হইতে মনকে বিমুক্ত করিয়া একান্ত ধ্যানে আল্লাহর দরবারে নিকেজে হাকির করিয়া 'আউযুবিল্লাহ' ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর اَللّٰهُ حَاضِرِيْ اللّٰهُ نَاظِرِيْ اَللّٰهُ مَعِيْ (আল্লাহু হাদিরী, আল্লাহু নাযিরী, আল্লাহু মায়ী) পাঠ করিে এবং একাগ্র চিত্তে উাহর মর্শ ধ্যান করিবে। ধারণা করিবে, আল্লাহ তা আলা সব সময়ই হাযির রহিয়াছেন, সতত তিনি আমার সঙ্গী"। এই ধ্যানে এত মগ্ন হইবে যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য সবকিছু এমন কি স্বীয় অস্তিত্বের খেয়ালও যেন তাহার বিলুপ্ত হইয়া যায়। সামান্যক্ষণের জন্যও যদি উক্ত ধ্যানে ব্যাঘাত হয় বুঝিবে মুরাকাবা এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই। শুরুতেঅবশ্য এই মুরাকাবায় কষ্ট হয় কিন্তু অভ্যাস হইয়া গেলে আর কোন কষ্টবোধ থাকে না। অধিকন্তু এই ্যান হইতে বিরত থাকাই বরং মুশকিল হইয়া দাঁড়ায় তবে এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছান ক্রমান্বয়েই সম্ভব হইয়া থাক। সুতরাং শুরুতেই অক্ষম হইয়া উহা পরিত্যাগ করিতে নাই। করিব বলেন ঃ

হিম্মত ও দৃঢ় চিত্তের সহিত যে কাজ করা হয়
কাঁটায় পরিপূর্ণ হইলেও উহা পুষ্পস্তবকে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় মুরাকাব ঃ যে সমস্ত রোগের রুন মানুষের মন আল্লাহবিমুখ হয় উহার প্রধান কারণ তিনটি। এক, হাদীসে সাফস অর্থাৎ গোপন ও প্রকাশ্যে স্বীয় নাফসকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কাল্পনিক আলোচনায় বিভোর রাখা। দুই, নাফসী খাতারাত বা মনে অনিচ্ছকৃত সৃষ্ট ধারণা ও আশংকাসমূহ। তিন, অন্য জিনিসের প্রতি লক্ষ্য প্রদান ও জাগতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিতি। বাতেনী শুগল আশগাল হইতেছে এই সমস্ত রোগের মূল চিকিৎসা। তবে এই চিকিৎসাও কয়েক ধরনের হইয়া থাকে। হাদীসে নাফসের বেলায় ইসমে যাত (অর্থাৎ আল্লাহ) আর নফসানী খাতরাতের বেলায় আল্লাহর মৌলিক গুণবাচক নামসমূহের ধ্যান করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদেও প্রতিও দিলের তাওয়াজ্জুহ রাখিতে হইবে।

মুরাকাবা-এ-রুয়াত বা পরম সত্তার দর্শন ধ্যান

ইহাতে আল্লাহর দর্শনের ধ্যান করিবে। اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى (অর্থাৎ ইহা কি জানে না যে, আল্লাহ দেখিতেছেন) এই আয়াতের উপর গভীর লক্ষ্য নিবদ্ধ করিবে। সব সময় এই ধ্যান অন্তরে জাগরুক রাখিবে, যেন ক্রমে তাহার মধ্যে ঐ পরম সুরতকে প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

মুরাকাবা-এ-মায়িআত বা পরম সত্তার সংসর্গের ধ্যান

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ (যেখানেই তোমরা থাকন না কেন আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন) এই আয়তাটির মর্ম ধ্যান কিরবে। দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে গোপন ও প্রকাশ্য, সুস্থতা ও অসুস্থতা সকল অবস্থায়ই আল্লাহ আমার সঙ্গে রহিয়াছেন। আর এই ধ্যানেই সর্বদা বিভোর হইয়া থাকিবে।

মুরাকাবা-এ-আকরাবিয়্যাত বা পরম সত্তার নৈটট্যের ধ্যান ঃ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (শাহরগ হইতেও আল্লাহ অধিক নিকটবর্থী) এই আয়তাটির অর্থ ও মর্মের প্রতি খেয়াল করিয়া ধ্যান করিবে। আর আল্লাহ আমার নিকটবর্তী-এই ধ্যানের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে।

মুরাকাবা-এ-ওয়াহদাত বা একত্বের ধ্যান ঃ হামা উস্ত বা সবকিছুতেই তিনি (আল্লাহ) এবং হুয়াল আওয়ালু হুয়াল আখির' বা আদি ও অন্তেও কেবলমাত্র তিনি (আল্লাহ)-এই কথা মুখে বলিবে এবং ধ্যন করিবে যে, তিনি ব্যতীত কোথাও কিছু নাই। আর এই ধ্যানেই আত্মবিভোর হইয়া থাকিবে।

মুরাকাবা-এ-ফানা বা স্বীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির ধ্যান ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ .

(পৃথিবীর সব কিছুই ধ্বংস হইয়া যাইবে কেবলমাত্র মহাপরাক্রমশালী ও সম্মানের অধিকারী আপনার প্রভুই বিরাজিত থাকিবেন) এই আয়াতটির মর্ম খেয়াল করিয়া এই ধ্যান করিবে যে, সবিকিছুই একদিন ফানা হইয়া যাইবে আর সকল ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষ হইতে মুক্ত আল্লহা পাকই কেবল সর্বদা বিরাজতি থাকিবেন। মানসচক্ষে এই অবস্থিটি অবলোকন করিবে এবং এই ধ্যানেই নিমগ্ন হইয়া থাকিবে। ইহাতে উক্ত বিষয়টির মর্ম তাতার নিকট আরো সুস্পষ্ট, আরো উদঘাটিত হইয়অ উঠবে। স্বীয় অস্তিত্বের অনিত্যতা এবং স্বীয় জ্হান এবং বুদ্ধির অক্ষমতা ও বিলুপ্তি আরো পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

অন্যান্য ধরনরে মুরাকাবা ঃ অন্যান্য আরো বহু ধরনের মুরাকাব রহিয়াছে। যথা اَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ অর্থাৎ যে দিকেই ফিরিবে সে দিকেই আল্লাহ পাক বিরাজমান, وَكَانَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا অর্থাৎ আল্লহ সতত তোমাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করেন, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ مُّحِيْطًا অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) সবকিছু বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ তিনি তোমাদের মধ্যেও বিরাজমান, তোমরা কি তাহা লক্ষ্য র না? এই সমস্ত আয়াতের মর্ম ও মুরাকাবা করার প্রচলন সূফীগণের মধ্যে রাহিয়াছে।

অন্য একটি মুরাকাবা ঃ কেহ কেহ চক্ষু খুলিয়া রাখিয়া আকামের দিকে বা সামনের দিকে নিষ্পলক তাকাইয়া থাকিয়া মুরাকাবা করার প্রায়স পান। এই ধরনের শুগলের মাধ্যমে আনওয়ারে ইলাহিয়্যা বা ঐশী জ্যোতির তাজ্জালী পরিদৃষ্ট হয়। পলকমাত্র মুহূর্তে প্রেমবহ্নি তাহার সমস্ত শরীর আবেষ্টন করিয়া ফেলে এবং তাহার মধ্যে আল্লাহর ইশক ও প্রণয় জন্ম লাভ করে। এই স্তরকে মুরাকাবা-এ-হাওয়া অর্থাৎ মরুৎ ধ্যান বলা হয়। অনেক সুফীই এই মুরাকাবায় বিমগ্ন হইয়া বহুদিন পর্যন্ত বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া বিরাজ করেন।

মুরাকাবা ঃ অন্ধকার এবং ক্ষুদ্র একটি প্রকাষ্ঠে বসিয়া চক্ষু উন্মোচিত করিয়া বায়মণ্ডলের কোন একটি স্থান নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। ইহাতে সে আনওয়ার ও ইলাহী জ্যোতিসমূহের প্রকাশ দেখিতে পাইবে এবং অনন্তময়ের সহিত তাহার মিলন সম্ভব হইবে।

মুরাকাবা ঃ সুফীগণের অনেক মুরাকাবায় নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া থাকেন এবং এই ধ্যান করেন যে, আমার কোন অস্তিত্ব নাই। মূলত ঃ অস্তিত্ব কেবলমাত্র তাঁহারই (আল্লাহর)। পরিপূর্ণএকাগ্রতার সহিত যদি এই ধ্যান সে করিতে পারে তবে 'সত্য আসিল মিথ্যা দূরীভূত হইল'- এই বাক্যটির মর্মানুপযায়ী সালিকের বা খোদান্বেষীর অন্তর হইতে নিজের ধারণা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই পদ্ধতিটি মনযিলে মকসুদে পৌঁছার পক্ষে অধিকতর নিকটবর্তী।

মুরাকাবা" সূফীগণের কেহ কেহ আল্লাহকে সুনির্মল ও সুইজ্জ্বল নদী স্রোতের মত ধ্যান করেন এবং নিজেকে এই বারিরাশির একিট ক্ষুদ্র বিন্দু বাবিয়া ইহাতেই বিভোর ও মগ্ন হইয়া থাকেন।

মুরাকাবা ঃ কেহ কেহ এই পরম ও নির্মল জ্যোতিরাশিকে নূরে গায়র মুতানাহী বা অন্তহীন জ্যোতিসালার এক সুপরিচ্ছন্ন পানর নদী বলিয়া ধ্যান করেন। একা নিজেকে ঐ জ্যোতিরাশির মাঝে বিলীন একটি বিন্দু বলিয়া মনে করেন।

মুরাকাবা ঃ কেহ কেহ যাতে ইলাহীকে (আল্লাহর সত্তাকে) অনন্ত এক আঁধার রাশি বরিয়া ভাবেন এবং নিজেকে ঐ আঁদারে বিলুপ্ত একটি ছায়া বলিয়া মনে করেন।

যা হউক, আল ।লাহ পাকের অনন্ত নূররামিকে উল্লেখিত বিষয়সমূহ সদৃশ ধারণা করার কারণ হইল, ইহাকে মানুষের বস্তুগত ও অপরিপক্ক জ্ঞান ও বুদ্ধির পক্ষে তাঁহাকে ধ্যান করা সম্ভবপর হইয়া উঠে। তাহা না হইলে সকল প্রকার জাগতিক বস্তুতান্ত্রিকতা হইতে পবিত্র দিকহীন, সীমাহীন আল্লাহ পাকের সাহিত মূলতঃ এই সমস্ত বিষয়ের সাদৃশ্যগত কোন সম্পর্ক নাই। এইগুলির সহিত তাঁহার কোনরূপ তুলনাই চলিতে পারে না। এই ধরনের সাদৃশ্য হইতে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। মুরাকাবার এই সমস্ত পদ্ধতি ও তরীকা প্রচলনের মূল উদ্দেশ্য ইহতেছে স্বীয় কল্পিত অস্তিত্বের বিলুপ্তি সাধন। কেননা স্বীয় অস্তিত্বের ধ্যান সালিক ও খোদার রাহের যাত্রীকে অনন্ত সত্তার অস্তিত্বের ধ্যান করা হইতে বাধা দেয়। ধ্যান নিমগ্নতা, আত্মবিভোরতার বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বীয় সত্তাকে যদি ফানা করিতে পারিবে, বিলীন করিতে পারিবে সেই অনুপাতেই সে অনন্তময়ের মিলন লাভ করিতে সক্ষম হইবে। মোট কথা হইল, স্বীয় কর্ম, গুণাবরী ও অস্তিত্বকে আল্লাহ পাকের গুণাবলী, ক্রিয়াকাণ্ড এবং অস্তিবেত্ম মাঝে বিলীন বলিয়া ধারণা করিবে এবং এই ধ্যানেই নিজেকে নিমগ্ন রাখিবে। ইহাতে আসল হাকীকত ও মূল তাৎপর্যসমূহ তাহার নিকট উদঘাটিত হইবে এবং তাহার পক্ষে মনযিলে মকছুদে পৌঁছান সম্ভব হইবে।

ফাঃ উল্লেখিত যিকরে জেহরী সিরী (সরব ও নিরব) সমূহের মাধ্যমে মূরীদ যখন উন্নতি করিয়া পূর্ণতায় পৌছিয়া যায়, তখন তাহার নিকট মূর তাৎপর্য ও মর্ম, হাকীকত ও ভাব (ছূফীগণের পরিভাষায় যেগুলিকে যিকরে রুহী (আত্মিক) ও সির্রী (গোপন) এবং ফিকরে মুশাহাদা মুআয়ানা (প্রত্যক্ষ দর্শন বা সমক্ষ দর্শন) বলা হয়, সেই সবকিছু উন্মেচিত হইয়া যাইবে, আর এই মাকাম বা স্তরে ইলাহী আনওওয়ার ও ঐশী জ্যেতিরাশির প্রাবল্যে এবং আল্লাহর পরাক্রম ও মহিমা রসামনে সে অনেক সময় বেহুশ হইয়া যাইবে। জ্ঞান ফিরার পরও নিজেকে দুর্বল ও হীন মনে করা উচিত। তাহার সব সময়ই উন্নয়ন প্রয়াসী থাকা কর্তব্য। ইহার পর তাহার সামনে নূরে জামালীল (অনন্ত ময়ের প্রত্যক্ষ ললিত জ্যোতি) প্রকাশ গটিবে। এই নূরের প্রাবল্যে সকল ইন্দ্রীয়নুভূতি বেকার হইয়া যাইবে এবং আভ্যন্তরীণ দৃষ্টি শক্তি তীব্র হওয়ায় ইহাকে এমনকি সে চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতে তখন সক্ষম হইবে। এই অবস্থা তাহার মাঝে যদি স্থিতিশীল এবং জয়ী হ্য়া উটিতে পাে রতবে তাহার ইচ্চা এবং কাজ আল্লহারই ইচ্ছা এবং কাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিবে। 'তিনি (আল্লাহ) প্রতিটি জিনিষ বেষ্টন করিয়া রাকিয়াছেন'।

যেখানেই তোমরা থাকনা কেন তিনি (আল্লাহ) তোমাদরে সঙ্গে রহিয়ছেন, এই আাতদ্বয়ের মর্মানুসারে দর্শন শ্রবণ মোটকথা তাহার সকল কাজ আল্লাহ কাজ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সকল কিছুতেই সে আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে। তাহার লক্যষ একমাত্র আল্লহার দিকেই নিবদ্ধ থাকিবে। এই স্তর হইল কুরবে নাওয়াফেল এবং মাকামে মুশাহাদার স্তর। কোন শেষ নাই. কোন অন্ত নাই এই স্তরের। ইহার মাধ্যমে সালিক বা খোদান্বেষী ব্যক্তি সৃষ্ট বস্তু হইতে সৃষ্টিকর্তার দিকে লক্ষ্য ফিরাইয়া নেয়। সালিক যখন এই স্তরে পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হয় তখন তাহাকে বলা হয় মাজযুব "আমার মাধ্যমেই শুনে আমার মাধ্যমেই দেখে আমার মাধ্যমেই বলে, আমার মাধ্যমেই ধরে সেখানেই আমি কেবল আল্লাহকেই প্রত্যক্ষ করি"-এই অবস্থায় সে পৌছিয়া যায় তখন।

জনৈক রহস্যজ্ঞ কবি বলেন ঃ
খোদার জ্ঞান আজ ছুফীর জ্ঞানে লীন
কিন্তু বলিতে গেলে কারো হবে না প্রত্যয়।

এই স্তরে নূরের তাজাল্লীসমূহ শরীরী আকারেও কোন কোন সময় প্রতিভাত হইতে থাকে। এই নূরসমূহকেও নূরে ইলাহ বা ঐশী জ্যোতি

বলিয়া তাহার ধারণা করা উচিত। এই অবস্থায়ও যদি সে স্থির থাকিতে পারে তবে সে আরো উন্নত স্তরে যাইয়া পৌঁছিতে পারিবে এবং তাহার হৃদয় তাজাল্লীয়ে যাতী বা আল।লাহ সতআতর তাজাল্লী লাভে সক্ষম হইবে। এই তাজাল্লীতে সে আল্লাহর নূরকে নজীরবিহীন ও সাদৃশ্যবিহীণভাবে প্রত্যক্ষ করিবে এবং আল্লাহর অস্তিত্ব উপলব্ধিতে সক্শ হইবে। হিজাব বা কোনরূপ অনতরায় ছাড়া আল্লাহকে সে দর্শন করিতে পারিবে। নিজের বা অন্য কাহারো নিকট হইতে সে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড প্রকাশ পাইতে দেভিকে তাহা মূলত ঃ আল্লাহরই বলিয়া সে বুঝিয়ে পারিবে। এই স্তর হইল কুরবে ফারায়েজের স্তর। এই স্তরে পূর্ণতা লাভ হইলে সালিককে তখন 'মজযুবে সালিক' বলা হয় অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুর মধ্যে সে তখন আল্লাহর গুণাবলী এবং তাঁহার অস্তিত্বকে দর্শন করে। এই স্তরেরও কোন অন্ত নাই, কোন শেষ নাই। তাহার আরো উন্নতি হইলে এবং আল্লহার সত্তা ও গুণাবলীর তাজ্জাল্লী যদি সে লাভ করিতে পারে তবে এই তাজ্জাল্লীসমূহের সাথে তাহার নিমগ্ন হইয়া থাকে উচিত। এই তৃতীয় স্তরে পৌঁছার পর সালিক নিজেই আপাদমস্তক শিল্পকর্ত হইয়া যায় এবং اَلَا اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْئٍ مُحِيْط (শুনিয়া রাখ, নিশ্চয়ই তিনি [আল্লাহ] প্রতিটি জিনিস বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন) এই বাক্যাটির প্রকাশ তাহার মাধ্যমেই ঘটিবে। عَرَفَ رَبَّهٗ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ (যে ব্যক্তি নিজের পরিচয় পাইয়াছে, সে তাহার প্রভুর পরিচয় লাভ করিতে পারিয়াছে) এই বাক্যটির রহস্য তখন তাহার সামনে উদ্ঘাটিত হইয়া উঠিবে। আল্লাহর অস্তিত্ব উপলব্ধি ভিন্ন তাহার নিকট আর কোন কিছুরই ধ্যান থাকিবে না। সর্বতোভাবে সে আল্লাহর সুমহান অস্তিত্বের মাঝে ফানা হইয়া যাইবে, লীন হইয়া যাইবে। كُلُّ شَيْئٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ (আল্লাহ ভিন্ন আর সকল কিছুই ধ্বংসীমীল) এই কথাটির তাৎপর্যপও তাহার নিকট উন্মোচিত হইয়া উঠিবে। শুধুমাত্র পরম সত্যই তাহার থাকিয়া যাইবে।

এই স্থানে যদি সে اَلْاٰنَ كَمَا كَانَ (পুর্বেও যেমন এখনো তেমন) এর ধ্যান করিতে পারে তবে রূহকে (যাহা হইতেছে আল্লাহর যাতী নূর বা নিজস্ব জ্যোতি) অন্তরালবিহীনভাবে প্রত্যকক্ষ করিতে পারিবে। رَاَيْتُ رَبِّىْ بِرَبِّىْ (আমার প্রভুর আমি প্রভুর মাধ্যমেই দর্শন পাইয়াছি) এই বাক্যটিই সাক্ষ্য যে সালিক আল্লাহকে তাঁহার নূরে যাতী বা নিজস্ব জ্যোতির মাধ্যমে দর্শন করে পরিভাষায় ইহাকেই ফানা বা আল্লাহর অস্তিবে লীন হওয়া বলা হয়।

ফানার বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা

ফানার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। প্রতিটি স্তরেরও আবার নির্দিষ্ট সীমারেখা বিদ্যমান। যিকরে জিসিম (শরীরী যিকির), নাফস (নাফসের যিকির), যিকরে দিল (দিলের যিকির), যিকরে রূহ (রূহের যিকির) যিকরে সির- এই পাঁচটি স্তর যেমন যিকিরের রহিয়াছে তেমনি ফানারও পাঁচটি স্তর রহিয়াছে।

প্রথম স্তর ঃ যিকরে রব্বানীর প্রাধান্য স্তর। উহাকে যিকরে জিসমীও বলা হইয়া থাকে। ইহার প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে নাফসে আম্মারার বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক দোষসমূহ শরীয়ত নির্দেশিত চারিত্রিক ও নৈতিক ঘুনরাজিতে বিলীণ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় স্তর ঃ যিকর ও ধ্যানের প্রাধান্য স্তর। ইহাকে যিকরে নাফসীও বলা হইয়া থাকে। ইহার প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে নাফসে লাওয়ামার বৈশিষ্ট্য নাফসান খাহিশাত বা জৈবিক লিপ্সাসমূহ ইমকানী খাহিশ বা সম্ভাব্য প্রয়োজনের মাঝে বিলীন হইয়া যায়। ফলে শরীয়তের নির্দেশসমূহের উপর দৃঢ়ভাবে পাবন্দ থাকা স্মভ হয় এবং নাফসে মূলহিমের স্তর মুকাশাফা ও ইলহাম, অদৃশ্য রহস্য উদঘাটন ও অদৃশ্য শক্তির নির্দেশ প্রাপ্তির পদ্ধতিসমূহ তাহার নিকট উন্মোচিত হইয়া উঠে।

তৃতীয় স্তর ঃ যিকরে কলবীর প্রাধান্যের ম্যাধমে অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহের কাজ ও গুণাবলী প্রকৃত অস্তিত্বের অধিকারী সত্তা আল্লাহর কাজ ও গুণাবলীতে লীন হওয়অ। যাহাতে প্রতি বস্তুতে এবং প্রতি কাজে কেবলমাত্র আল্লহারই তাজ্জাল্লী সালিকের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে এবং সে নাফসে মুতমাইন্নার স্তর ইতমিনানে কলবী বা মানসকি প্রশান্তি লাভ করিতে পারে।

চতুর্থ স্তর ঃ যিকর রূহের প্রাধান্য স্তর। ইহাকে মুশাহাদাও বলা হইয়া থাকে। ইহার প্রাধান্য বিস্তারে মাধ্যমে সকল ধরনরে আধিক্য আল্লাহর একত্বে যেন লীন হইয়া যায়। এমনকি সালিকের সমক্ষে আল্লাহর যাত প্রত্যক্ষ করা ভিন্ন আর কিছুই যেন না থাকে এই স্তর 'মাকামে মুশহাদা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পঞ্চম স্তর ঃ যিকিরের স্বাদ গ্রহণ করার প্রতি লক্ষ্য না থাকা এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রতি বিরাগের নাম হইতেছে যিকরে সিরী। এই যিকরে সিরীর বৃদ্ধির ম্যাধমে সালিকের স্বীয় সত্তাকে অনন্ত সত্তার মাঝে লীণ করিয়া দেওয়াই হইতেছে এই স্তর। সালিকের তুষ্টিই ইহার মধ্যে নিহিত যে, স্বীয় সত্তার অস্তিত্ব-উপলব্ধি যেন তাহার না থাকে। কারণ, নিজের উপলব্ধি যদি

তাহার তবে ফানাইয়্যাত বা আত্ম-লীন হওয়ার ধ্যান তাহার বিনষ্ট হ্য়িা যাইবে। যাহা হউক, এই স্তরে সালিক বা আল্লাহ অন্বেষী ব্যক্তি 'ফানা উল-ফানা' বা আত্ম-লীনের ধারণাও লীন হওয়ার স্তরে যাইয়া উপনীত হয়। তখন স্বীয় জ্ঞান বা অস্তিত্ব ইত্যাদির কোন বোধ আর বাকী থাকে না। 'লী মা' আল্লাহি ওয়াকতুন' 'অর্থাৎ আল্লাহর সহিত আমার বিশেষ এক সময় রহিয়াছে-এই বাক্যটির দ্বারা ঐ স্তরের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াচে। আর এই প র্যায়ে উপনীত হওয়ার পর সারিকের মধ্যে মান রাআনী ফাকাদ রাআল 'হাক্কা' অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে দর্শন করিল সে অনন্তময়কেই দর্শন করিল-এই প্রবচনটির পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। কবি বলেন ঃ

'অনন্তময়ের মাজে তুমি লীন হও, তওহীদের অর্থ ইহাই
লীন হওয়ার বোধও লীন করে, তফরীদের অর্থ ইহাই।

এই পর্যায়ে সালিক স্বীয় লক্ষ্য 'সায়র ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহর দিকে যাত্রা) এবংস্বীয় ধ্যান 'সায়র ফীল্লাহ' (অনন্ত সত্তায় পরিভ্রমন) সব পরিসমাপ্তি করিয়অ পরম লক্যষ প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রকাশই সকল সৃষ্টির মূল কার্যকারণ-এই কথার জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সাকিরে স্বীয় অস্তিত্ব একেবারে বিলীন হইয়া যায় তখন। এই স্তরে যাইয়াই হযরত বায়েযীধ বোস্তামী বলিযাছিলেন, যতদিন আমি গায়ব ছিলাম, দুরে ছিলাম, পরমময়কে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতাম কিনতু কেবল নিজেকেই দেখিতে পাইতাম; এখন ত্রিশ বৎসর ধরিয়া নিজেকে তালাস করি কিন্তু পরমময়কেই কেবল দেখিতে পাই।

এই মরতবার তাজ্জাল্লী একবার মাত্র যদি কোন সালিকের উপ পড়ে তবে সে ওলীয়ে কামিলে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু এই মরতবা প্রকাশ খুব কমই ঘটিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, সপ্তাহে এক দুই মুহূর্ত বা দিনে দুই এক মুহূর্ত বা দুই তিন দিনে দুই এক মুহূর্ত অথবা কম বেশ এই অবস্থায় প্রকাশ হইয়া থাকে। মোটকথা, ইহা আরিফবিল্লাহ বা আল্লাহর মারিফাত হাসিলকারী ব্যক্তির অবস্থা ভেদের উপর নির্ভরশীল। যে পর্যায়ের অবস্থা তাহার হইবে সেই অনুসারেই তাহার মাঝে ফানাইয়াত বা সত্তালীণ হওয়ার অবস্থার সৃষ্টি হইবে। যেকোন ব্যক্তি উহা উপলব্ধি করার বিষয় নহে। مَنْ يَّشَاءُ ـ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ ইহা কেবল শুধু আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তিনি উহা দান করেন। এই 'ফানা' ও স্বীয় সত্তা বিলীনের

স্তরে আল্লাহ যখন তাহার প্রিয় বান্দাকে স্থায়িত্ব দিতে চাহেন তখন স্বীয় নূর ও জ্যোতিরশ্মির মাধ্যমেই তাহাকে স্থায়িত্ব দেন। এই স্তরকে বলা হয় 'জম্উল-মজা' বা একত্রিত্বের একত্রিত স্তর। আর এই স্তরই হইতেছে সর্বশেষ স্তর।

ফা ঃ বাকাবিল্লাহ হইতেছে অন্ত হ্এিত আদির দিকে প্রত্যাবর্তনের নাম। আদিতে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি বস্তুসমূহের উপর খুবই ভাসা বাষা ধরনের হইয় থাকে যাহা হউক, বাকাবিল্লাহর স্তর মারাত্মক বিভ্রমের স্তর। সত্তালীন ও বস্তুর নিদ্ধারণ ও উপলব্ধি খতম হওয়ার পর এই স্তরে পুনরায় বস্তু নির্ধারণের দিকে ফিরিয়া আসিতে হয়। এই সময় সর্বপ্রথম দৃষ্টিতে পড়ে প্রকৃত অস্তিত্বশীল সত্তা আল্লাহ্ পাকের উপর। অতৎপর অনন্ত সত্তার নূর ও জ্যোতিরশ্মিতে সে বাহ্যিক বস্তু নির্ধারণ প্রক্রিয়া অবলোকন করে। নির্ধারণ বিষয়ে যদিও উভয় অবস্থা দৃশ্যত ঃ এক, কিন্তু এতদুভয়ের মৌল স্বাতন্ত্র্য অপ্রকাশ্য নহো। একজন আরিফ বা আল্লাহর সম্যক মারিফাত হাসিলকারী ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে, প্রতি অভস্থায় আল্লাহর অস্তিত্বের ধ্যানেই মগ্ন থাকেন। কোন বস্তুরই আল্লাহকে দর্শন করার পথে বা আল্লাহ দর্শন অন্যান্য দ্রব্য দর্শন করার পথে তাহার বাধা হইয়া দাঁড়ায় না। 'কেননা, এই আরিফ, 'হাকীকতে ইনসানী' মানুষের প্রকৃত তাৎপর্য স্তর 'উলহিয়্যাত'-এ যাইয়া উপনীত হইতে পারিয়াছেন। ঈশ্বরত্বের জন্য যেমন 'উজুব ও ইমকান' অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী ও সম্ভাব্য সকল কিছু সমান তেমনি ভাবে প্রকৃত আরিফেল নিকট পরম সত্যময় সৃষ্টি উপলব্ধির পথে অন্ত রায় হইয়া দাঁড়ায় না। 'ওযামা রাআইতু শায়্যান ইল্লা রাআইতুল্লাহা ফিহী' অর্থাৎ যে বস্তুর দিকেই তাকাইয়াছি সেই বস্তুতেই কেবল আল্লাহকে দর্শন করিয়াছি- এর পর্যায় হয় তাহার। সকল সৃষ্টিই অস্তিত্বহীন আর আল্লাহ কেবলমাত্র প্রকৃত অস্তিত্বশীল-এই কথার নিশ্চিত জ্ঞান হয় তাহার। আল্লাহর জ্ঞানেই নিজেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আবদ্ধ দেখিতে পায় সে। আর এই আবদ্ধতার কারণেই সে নিজেকে একজন দাস, একজন বান্দা বলিয়া ভাবিতে পারে। আর তখনই সে বলিতে পারে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ মুহাম্মাদুর রাসূলুর্লাহ'- আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ বা মাবুদ নাই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার রাসূল বা বার্তাবহ। এই পর্যায়ে সে আল্লাহর প্রতিনিধি হইয়া মানুষ-জনকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইতে থাকে। বাহ্যত সে বান্দা, আভ্যন্তরীণভাবে সে আল্লাহর প্রতিভূ হইয়া দাঁড়ায় তখন। এই স্তরকে বলা হয় 'বারযাখুল-বারাযিখ'। সাম্ভাব্য ও অবশ্যম্ভাবী সকল কিছুই এখান সমান। কাহারো এখানে কাহারো উপর প্রাধান্য নাই।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ

অর্থাৎ-দুই সমুদ্রের স্রোতধারা একত্রে মিশিতেছে অথচ এতদুভয়ের মাঝে অনতিক্রমণীয় এক বাধা বিদ্যমান। এই স্তরে উপনীত হওয়ার পর আরিফ বা মারিফতের অধিকারী ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবীর উপ রকর্তৃত্বের অধিকারী হয়। سَخَّرَلَكُمْ مَا فِىْ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِىْ الْاَرْضِ (আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদের বাধ্য অনুগত করিয়া দেওয়া হইয়াছে)- এই আয়াতটির মর্ম তাহার নিকট উদঘাটিত হইয়া উঠে। সে ক্ষমতার অধিকারী হয় আল্লাহ পাকের যেকোন তাজাল্লী ও জ্যোতিরশ্মিকে নিজের উপর আপতিত করিয়া নিতে পারে। আল্লাহর যেকোন গুণে ইচ্ছা নিজেকে বিভূষিত করিয়া উহার তাছীর ও প্রভাবের প্রকাশ ঘটাইতে পারে। যেহেতু তাহার মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী বিদ্যমান এবং যেহেতু সে আল্লাহর চরিত্রে বিভূষিত এবং اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهٗ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً - বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার নেয়ামত যেহেতু সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে সেহেতু সে 'নূরুন আলা নূর' (জ্যোতির উপর জ্যোতি)-এর পর্যায়ে উপনীত হইয়া যায় এবং সকল হাল ও অভস্থা তাহার অনুগত হইয়া যায়। কবি বলেন ঃ

এই রোগের (আল্লাহ প্রেম) ঔষধ পায় নাই কেহ-
এ পথের শেষ দেখে নাই কেহ
ভাই হে আমার, এই দরবারের কোন অন্ত নাই
যে পর্যায় তোমার আরোহণ হউক না তবু
যাত্রা বিরতি যেন হয় নাকো কভু।

ফা ঃ নির্জন বা লেকা সমক্ষে, সশব্দে বা অনুচ্চকণ্ঠে সকল সালিককে রাত্র দিন যিকিরে মশগুল থাকা কতভ্র, যাহাতে সে নিজেকে, নিজের যিকিরকেও ভুলিয়অ যাইয়া একেবারে লীন হয়িা যাইতে পারে। ইহাতে আল্লাহ চাহেনত যিকিরকারীর হৃদয়ে অগণিত ও অসংখ্য নূর ও ঐশী রহস্যরাজির প্রতিবম্বি ঘটিতে থাকিবে। এই নূররাজির আলোকে অনন্ত সৌন্দর্যের ঐশী আস্বাদন এবং তাজ্জাল্লীয়াতে হাজ্জানী (আল্লাহর জ্যোতিরশ্মি) তাহার লাভ হএব ও অভিষ্ট লক্ষ্যে সে পৌঁছাইতে সক্ষম হইবে।

ফা ঃ এই পর্যায়ে সকলেরই হুঁশিযার থাকা কর্তব্য। খেয়াল রাখিতে হইবে, মূল লক্ষ্য বহির্ভূত এই নূরের প্রতি যেন লক্ষ্য নিবদ্ধ না হইয়া পড়ে এবং পরিণামে ইহার আস্বাদনে বিভোর হইযা ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে যেন নিপতিত না হয় ও প্রেমাস্পদের অভিমান প্রসূত আগুনে দগ্ধ না হয়। আল্লাহ'র নূর ও জ্যোতিসমূহ কেবল জালালীই (পরাক্রমধর্মী) নহে, জামালীও (ললিত ও স্নেহধর্মী) রহিয়াছে বটে, তবু প্রতিটি বিষয়েরই স্তরভেদ লক্ষ্য রাখা

উচিত এবং শুভ অশুভের বিচার থাকা জরুরী। তাহা না হইলে, কুফর ও যিন্দিকিয়্যাত বা খোদাদ্রোহিতার আশংকা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সুতরাং শুভ ও অশুভ এবং ভাল ও মন্দ নূর বা জ্যোতিরাশির আলামত ও চিহ্নাদি সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার।

ভাল এবং মন্দ, নূর বা জ্যোতিরাশির অবস্থাসমূহ

সালিক বা খোদান্বেষী ব্যক্তির মন যখন যিকির করা শুরু করে, সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে যখন ইহার বিস্তার হয় আর আল্লাহ ভিন্ন অন্য সবকিছু হইতে তাহার মন সম্পূর্ণভাবে পবিত্র ও নির্মল হইয়া যায় এবং রূহানিয়্যাত ও আধ্যাত্মিকতার সহিত তাহার পরিপূর্ণ সম্পর্ক যখন কায়েম হইয়া উঠে, তখন তাহার মাঝে আনওয়ারে ইলাহী বা ঐশী জ্যোতিরাশির প্রকাশ গটিতে থাকে। কখনো কখনো সে এই নূর বা জ্যোতিরামির প্রাকশ নিজের অভ্যন্তরে দেখিতে পায়। আবার কখনো বা নিজের বাহিরে ইহা তাহার প্রত্যক্ষ হয়্

শুভ ও মঙ্গল নূর হইল সেইগুলি যেগুলি সে দিল, সীনা (বুক) বা মাথা বা উভয় দিকে প্রত্যক্ষ করে। কখনো কখনো এই নূর সমস্ত শরীরেও তাহার পরিদৃষ্ট হইবে। আর যে সমস্ত নূর ডানে বামে, কখনো সম্মুখে মাথার দিকে পরিদৃষ্ট হয় তাহাও বাল। তবে এইগুলির দিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত হইবে না। বিশেষ কোন রঙের নূর যদি ডান কাঁধের বরাবর সামনে পরিদৃষ্ট হয় তবে উহা ফেরেশতাগণের নূর। যদি সাদা রঙের হয় তবে উহা কেরামান কাতিবীন (নেকীবদী লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ)- এর নূর। আর যদি সবুজ পোশাক পরিহিত সুন্দর কোন মানুষ বা অন্য কোন বাল চেহারায় ঐ নূর প্রকাশ পায় তবে বুঝিতে হইবে ইহারা ফেরেশতা। যিকিরকারীর হেফাজতের জন্য ইহারা আসিয়াছেন। ডান কাঁধ হইতে কিছুটা সরিয়া অন্য দিকে বা চক্ষু বরাবর যদি উহা পরিদৃষ্ট হয় তবে বুঝিতে হইবে ইহা মুর্শিদ বা পীরের নূর, যিনি হইলেন এই পথে তাহার অভিভাবক সহচর। আর যদি উহা একেবারে সম্মুখপানে হয় তবে বুঝতে হইবে ইহা হইতেছে নূরে মুহাম্মদী, যিনি তাহাকে সোজা ও সরল পথের শিক্ষা দেন।

যদি বাম কাঁধের দিকে উহা দেখা যায় তবে বদী লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতার প্রতিচ্ছবি বলিয়া বুঝিতে হইবে। বাম কাঁধের দিকে একটু দূরে পরিদৃষ্ট হইলে উহা যেকোন রঙেরই হউক না কেন উহাকে শয়তানের আলো বলিয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলে, উহা দুনিয়ার বিকিরণ। এমনিভাবে যে প্রতিচ্ছবি বা শব্দ পিছনে বা বাম দিকে দৃষ্টিগোচর হইবেবা শুনা যাইবে উহাও শয়তানের ধোঁকা বলিয়া বিবেচনা করিবে।

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) পড়িয়া উহাকে বিতাড়ন করিবে এবং আউযুবিল্লাহ পাঠ করিবে আর এই দিকে কোন ধরনের লক্ষ্য করিবে না।

উপর বা পিছনের দিকে হইতে ঐ নূর আসিতে দেখিলে বুঝিবে উহা তাহার নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত ফেরেশতাগণের নূর। যদি দিকহীণ ভাবে উহা প্রকাশ পায় এবং মনে ভীতির সৃষ্টি করে ও উহা দূরীভূত হওয়ার পর বাতেনী হুযুর বা আভ্যন্তরীণ উপস্থিতি সৃষ্টি না করে তবে বুঝিতে হইবে উহা শয়তানের। এটা সময় 'লা হাওলা' পড়া উচিত। আর এমনি ভাবে দিকহীনভাবে যদি উহা প্রকাশ পায় এবং বিদূরিত হওয়ার পরও যদি ইহার বাতেনী হুযুর বা আভ্যন্তরীণ উপস্থিতির আস্বাদন বিনষ্ট হয়, অধিকন্তু তাহার মিলনাগ্রহ পূর্বের মতই তীব্র অনভূত হয় তবে উহাই হইতেছে 'নূরে মতলূব' বা অভীষ্ট সেই জ্যোতি। যাহার জন্য এই পথ পরিক্রমণ। আল্লাহ পাক আমাদের সখলকে উহা দান করুন।

ধাঁয়া বা আগুনের মত রঙে যদি উহাকে বুক বা নাভির উপরে দখা যায় তবে উ হইতেছে খান্নাস ময়তানের নূর। এমতাবস্থায় 'আউযুবিল্লাহ' পড়া উচিত। যদি সীনার ভিতর বা দিলের ভিতর প্রকাশ পায় তবে উহা সাফা-এ-দিলের নূর। আর লাল বা কিছু যদি হলুদ মিশ্রিত লাল রঙের প্রকাশ পায় তবে উহা দিলের নূর। আর যদি নিরেট সাদা রঙের হয় তবে উহা রূহের নূর যাহা তালিব ও আল্লাহ সন্ধিৎসু ব্যক্তির দিলে তাজাল্লীর মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে। মাথার দিক হইতে যদি উহা প্রকাশ পায় এখনও উহা ঐ রূহেরই নূর। সূর্য রঙের নূরও রূহের নূর। কেহ কেহ এই রঙের নূরকে তাহার স্বীয় অস্তিত্বের নূর বলিয়া বিবেচনা করেন। উপরের দিক হইতে হইতে রূহের, চাঁদের মত হইলে উহা দিলের নূর বলিয়া বিবেচ্য। কেহ কেহ বলেন, সামনের দিকের নূর হইতেছে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নূর। 'সুলতানান নানীরা' বা 'সুলতানাম মাহমুদা'- এর মাধ্যমে যে নূর হয় তাহা যাত বা স্বীয় অস্তিত্বের নূর।

এই সকল কিছুতেই সালিকের কর্তব্য হইতেছে 'মতলুব' বা পরম অভীষ্টজ ভিন্ন আর কোন নূরের দিকেই যেন তাহার লক্ষ্য নিবন্ধ না হয়, অন্য কোন নূরেই যেন তাহার পরম আস্বাদন ও পুলক না হয়। বরং 'নূরে ইলাহী' বা ঐশী জ্যোতিরাশির পরিভ্রমণেরই যেন সে নিয়ম আগাইয়া যাইতে থাকে। কারণ, আল্লাহ্‌র তাজল্লীসমূহের কোন অন্ত নাই, কোন শেষ নাই।

যদি কাজল কাল রঙের অন্ধকার এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষীণ এবং মলিন নূরানী রেখা দৃষ্ট হয় তবে উহা হইতেছে 'নূরে নফী'। এই দিকে লক্ষ্য দিলে 'নফী অর্তাৎ আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল কিছু অস্বীকৃতির স্তর তাহার অর্জন হইবে। আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল কিচু হইতে অন্তর পরিষ্কার হওয়অ এবং আসারী (প্রভাবগত), আফআলী (কার্যগত) ও সিফাতী (গুনগত) তাজাল্লীসমূহের মধ্যে (এইগুলির রঙ সাদা, সবুজ এবং লাল) বিভোর ও ফানা হইয়া যাওয়াই হইল মূল মকসুদ। হুঁশ ফিরার পরও ভালবাসায় ব্যথা, মিলনাগ্রহ ও প্রেমাতিশয্য আরো বৃদ্ধি পাইবে এবং এক তাজাল্লীর স্ত র হঐিত অন্য তাজাল্লীর স্তরে উন্নতি করিয়া যাইতে থাকিবে এবং উহার আস্বাদন লাভের পুলকিত হইব। ইহার প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা কখনো সম্ভবপর নহে। এই আরোহ পরিভ্রমণ শেষ হওয়ার পর তাজাল্লী-এ-যাতে-এর তাজাল্লীর প্রকাশ হইবে। 'চক্ষের কাল রঙে'র মত হইতেছে এই তাজাল্লী-এ-যাতীয় রঙ। ইহাতে আরিফেল বা আল্লাহর মারিফত প্রাপ্ত ব্যক্তির 'ফানা-উল-ফনাা' বা বিনাশনের বিনাশন প্রাপ্তি ঘটে।

জানিয়া রাখা দরকার যে, এই সমস্ত তাজাল্লীর শুরুতে (এই বস্তু জগতের অভস্থানুসারে) সালিকের ফলবে বিভিন্নবাবে আনওয়ার ও জ্যোতিরাশির প্রকাশ হইতে দেখা যায় এবং সালিক এই নূররাশির অুনসাে রস স্বয়ং নূরে নূরমহ হইয়া এই নূর বা জ্যোতি-জগতে পরিভ্রমণ করে। এমতাবস্থায় এই সমস্ত আস্বাদনের দিকে সালিকের দৃষ্টি প্রদান করা ইচত নহে, বরং এই সকল কিছুকেই আল্লাহর কুদরত মনে করিয়া প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার দিকেই তাহার সকল ধ্যান ও সকল লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখা কর্তব্য। পীর ও মুর্শিদের সাহায্যে ইনশাল্লাহ সে আকাশে পৌছিয়া যাইতে সক্ষম হইবে এবং আকাশের অত্যশ্চর্য জিনিসসমূহ সে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। আম্বিয়া, আওলিয়া ও ফেরেস্তাগণের রূহ হইতে সে নিয়ায হাসিল করিতে সক্ষম হইবে। ফেরেশতাগণকে বিভিন্ন আকৃতিতে সে দেখিতে পাইবে এবং তাহাদের মতই তাহাদের সহিত আকাশারোহণ করিয়া ঊর্ধ্বারোকের আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর বিষয়সমূহ সে অবলোকন করিবে।

এই সমস্ত জিনিসেও আস্বাদনে লিপ্ত হওয়া তাহার জন্য উচিত হইবে না। বরং আগ্রহ, প্রেম এবং উন্মাদনা লইয়া সে এই পথে উন্নতির দিকে আগাইয়া চলিবে। আল্লাহর রাহনামুায়ী এবং পীর ও মুর্শিদের তাওয়াজ্জুহতে সে আরশ ও কুরসীতে যাযা তখন পৌছিতে সক্ষম হইবে। কুরসীকে সে আরশের নূর ও জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় এবং সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল দেখিতে পাইবে।

এই সব কিছুর রসাস্বাদনের প্রতিও লক্ষ্য করা সালিকের উচিত নয় বং সবকিছুইে সে 'নফী' বা অস্বীকৃতির মধ্যে রাখিয়া আগাইয়া যাইবে। এই স্ত রে সালিক 'উনছুরিয়্যাত' অর্তাৎ বস্তুর উপাদনগত স্তর হইতে উন্নতি করিয় 'ইতলাক' অর্থাৎ বস্তু নিরপেক্ষ এক অবস্থায় যাইয়া পৌছিতে সক্ষম হইবে।

এই পর্যায়ে পৌছিয়াও তাহার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত হইব না। আল্লাহ তাৎআলার গুণাবলীর বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার মনে ইশকে ইলাহীর আগুন আরো তীব্র, আরো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে। ইহা তাহার সকল জ্ঞান ও হুঁশ জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিবে। জ্ঞান ফিরার পরও সে ইশক ও মুহাব্বাতের আতিশয্যে বেপরোয়া হইয়া কথাবার্তা বলিতে শুরু করিয়া দিবে। কিন্তু সে নিজে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এই অভস্থায় আল্লহা ভিন্ন আর সকল কিছু হইতে তাহার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে। মিলনাগ্রহ ও প্রেমাতিশয্য তাহার আরো বাড়িয়া যাইবে। আল্লাহর যদি মেহেরবানী হয় তবে সে এই ধরনের তাজাল্লী ধারা হইতেও আরো উর্ধ্বে উন্নতি করিয়া যাইতে সক্ষম হইবে এবং তাহার উপর পরম সত্তার কায়াহীন, হালহীন হাকীকী 'তাজাল্লী' দারা বর্ষিত হইবে। ইহাতেই সে তখন বিভোর হইয়া উঠিবে। যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু হইতে সে বে-খবর হইয়া পড়িবে। আর আল্লাহ ভিন্ন আর কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে না। আল্লাহর অস্তিত্বের সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী প্রমাণ সে পাওয়া যায়। হুঁশ ফিরার পরও পরময়ের মিলনাগ্রহাতিশয্যে বিশেষ এক হাল (দশা) তাহার মধ্যে অনুভূত হইতে থাকে এবং আল্লাহকে নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে থাকে। তখন মনছুর হাল্লাজের মত 'আনাল হক' (আমিই খোদা) বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠে অথচ নিজেও টের পায় না যে কি তাহার মুখ হইতে বাহির হইতেছে।

উল্লিখিত তাজ্জাল্লীসমূহ হইতেছে আফআলী (কার্যগত) ও সিফাতী (গুণ সম্পর্কিত) তাজাল্লী। ইহার পরও আল্লাহ'র অসীশ অনুগ্রহ ও মুর্শিদের তাওয়াজ্জুতে প্রেম ও অস্থিরতা বিদ্যমান থাকিলেও মতলুবে হাকীকী-পরম অভীপ্সিত সত্তা মহামহিম আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত সত্তার তাজ্জালী তাহার উপর নিপতিত হইবে। এই স্তরে সে নিজের সত্তার সম্পর্কেও এত বিভোর, এত বেখবর হইয়া পড়ে সে স্বীয় ফানা বা সত্তালীনের অনুভূতি পর্যন্তও তাহার লোপ পাইয়া যায় এবং ফানা উল-ফনাা-এর পর্যায়ে সে উন্নীত হয়।

ইহার পর যাইয়া সে 'ফানায়ে হাকীকী' অর্থাৎ প্রকৃত সাত্তালীনের দরজা হাসিল করিতে পারে। এমন সময়েই সে নূর ভোদের হেফাজত ক্ষমাত এবং আল্লাহর খিলাফতের সুমহান দায়িত্বে বিভূষিত হয়।

কাদরিয়া জিলানিয়া তরকীর বিভিন্ন যিকির শুগল

এই তরীকায় অল্প আওয়াজে কালিমা-এ-তায়্যিবার যিকির আদায়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। সশক্তিতে 'লা ইলাহা'-কে ভিতর হইতে টানিয়াদিলের উপর 'ইল্লাল্লাহ'র জরব লাগএিব। রাত্র দিন নির্জনে বসিয়া ইহার মশক করিবে এবং যথাকসম্ভব ইহার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকিবে। একশত বার হওয়অর পর একবার 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' পাল করিবে। এইভাবে এক বৈঠকে এগারশত বার পড়া উত্তম। এই যিকিরের অভ্যাস হইলে বিশেষ এক ধরনের বেবোলতা ওব্বাদ অনুভব হয়।

ইহার পর নিম্নবর্ণিত ভাবে নফী ইসবাতের তালীশ দেওয়া হয়। কিবলামুখী হইয়া দুইজানু অবস্থায় আদব সহকারে বসিবে এবং চক্ষু মুদিয়া সম্পূর্ণ শক্তি দিয়া 'লা'-কে নাভির নীচ হইতে বাহির করিয়া ডান কাঁধ পর্যন্ত পৌছাইয়া 'ইলাহা'-কে উম্মুদ্দিমাগ হইতে বাহির করিবে এবং দিলের উপর সশব্দে 'ইল্লাল্লাহ'র জরব লাগইবে। 'লা ইলাহা' বলা রসময় ধ্যান করিবেঃ আল্লাহ ভিন্ন কাহারো অস্তিত্ব নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহ মকসুদ (লক্ষ্য) নাই, আর তিনি ভিন্ন আর কেহ মা'বুদ (উপাস্য) নাই। ইহাতে আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল কিছুর অস্তিত্বের ধারণা দূরিভূত হইয়া যাইবে। আর 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় পরম প্রকৃতি সত্তার (আল্লাহ) অস্তিত্বের ধ্যান করিবে।

হাবসে ও নফী ইসবাত পদ্ধতি ঃ নাভির নীচে শ্বাস নামাইয়া আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল কিছুই 'নফী'- এর ধ্যান করিয়া 'লা'-কে ডান স্তনের সন্নিকট লইয়া গিয়া 'ইলাহা'-কে মস্তিষ্ক হইতে বাহির করিবে এবং দিলের উপর 'ইল্লাল্লাহ'-র জরব লাগাইবে। শ্বাস বাহির করিবার সময় আস্তে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠ করিবে এবং সীনার দিকে ইশারা করিবে।

প্রথম দিন এই আমল তিনবার করিবে। পরে প্রতিদিন এক একবার করিয়া উহা বৃদ্ধি করিয়া ক্রমান্বয়ে দুইশত বা রবা ইহার বেশী সংখ্যা পর্যন্ত যাইয়া পৌছিবে। পূর্বে উহার উপকারিতার বর্ণনা করা হইয়াছে।

পাস আনফসা পদ্ধতি ঃ শ্বাস ত্যাগ করার সময় 'লা ইলাহা' এবং গ্রহণ করার সময় আন্তরিকভাবে 'ইল্লাল্লাহ' বলিবে।

জরবসহ ইসমে যাত (আল্লাহ) যিকির পদ্ধতি ঃ অতঃপর জরবসহ ইসমে যাতের যিকির করিবে। ইহার তরীকা হইল, এক জরবী যিকিরের

বেলায় দিলের উপর সজোরে 'আল্লাহ্'-এর জরব লাগাইবে এবং শ্বাস পূর্ণভাবে বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত কমিতে থাকিবে। পরে উল্লিখিতভাবে পুনরায় জরব লাগাইবে। দুই জরবী যিকিরের সময় উল্লেখিত ভাবে পুনরায় জরব লাগাইবে। দুই জরবী যিকিরের সময় প্রথম জরব ডান হাটুতে আর দ্বিতীয় জরব কলবের উপর লাগাইবে!

তিন জরবী যিকিরের বেলায় ডনা হাঁটুতে প্রথম জরব, বাম হাটুতে দ্বিতীয় জরব এবং দিলের উপর তৃতীয় জরব লাগাইবে।

চার জরবী যিকিরের বেলায় ডান হাঁটুতে প্রথম জরব, বাম হাঁটুতে দ্বিতীয় জরব, সামনের দিকে তৃতীয় জরব এবং দিলের উপর চতুর্থ জরব লাগাইবে।

এক জরবী, দুই জরবী, তিন জরবী যিকিরের সময় দুইজানু আর চার জরবী যিকিরের সময় চারজানু হইয়া বসিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
কাদরিয়া রীকার শুগল অজীফাসমূহের বর্ণনা

ইসমে যাত খুফিয়া (গোপনে যিকির) পদ্ধতি ঃ উল্লেখিত যিকিরসমূহের পরে কাদরিয়া তরীকায় 'ইসমে যাত খুফিয়া'- এর তালীব দেওয়া হয়। ইহার পদ্ধতি হইল, জিহ্বা তালুর সহিত মিশাইয়া যতটুকু পরিমাণ সম্ভব দিল হইতে আল্লাহ আল্লাহ বলিবে এবং রাত দিন ইহারইধ্যান রাখিবে। ইহাতে এই বিষয়ে স্থিরতা অর্জন সম্ভব হইয়া উঠিবে এবং যিকির আদায় করিতে যাইয়া কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে না।

ইসমে যাতের (আল্লাহ শব্দের) মাধ্যমে 'পাস আনফাস' যিকির করিতে হইলে ইহার তরীকা হইল, নাভির মূল হইতে 'ইসমে' যাতের খেয়াল করিয়া 'হু' শব্দটিকে মনে মনে লম্বা করিয়া আকাশের দিকে টানিয়া নিবে। প্রতিটি শ্বাসের সহিতই এইরূপ বাবে আদায় করিয়া যাইবে।

এই ধরনের যিকরে আরার বিশেষ পদ্ধতি পূর্বে উল্লেক করা হইয়াছে।

বারযাখ-ই-আকবর শুগল ঃ ইহা আদায়ের একাধিক পদ্ধতি রহিয়াছে। প্রথম ঃ হাবসে দম অর্থাৎ দম আটকাইয়া উভয় ভ্রুর মাঝখানে দৃষ্টি রাখিবে। দ্বিতীয় ঃ বাতাসের মাঝে শূন্যে দৃষ্টি রাখিবে। তৃতীয় ঃ ডান চক্ষ খোলা রাকিয়া বাম চক্ষু বন্ধ রাকিবে এবং নাকের ডান কিনারায় ওজুদে মুতলাক (নিরংকুশঅস্তিত্বের অধিকারী) আলআহ পাকের নূরের (যে নূর সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত) ধ্যান করিবে। ইহাতে সে ঐ নূর প্রকাশ্যে পরিদৃষ্টমান পাইবে এবং ফানা-এ হাকীকী (প্রকৃত বিলীনতা) অর্জন করিতে পারিবে। এই পদ্ধতিতে পলকহীন থাকা শর্ত। এই সময় সে এই ধারনা করিবে যে, যাহাকে আমি দেখিতেছি, যাহাকে আমি পাইতেছি, তিনেই আমার আসল মকসুদ। ইহাতে সে ইনশা আল্লাহ অতি সত্বর মূল লক্ষ্য অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।

ইসমে যাত শুগল পদ্ধতি ঃ ইসম যাত শুগরের নিয়ম হইল, কোন একিট কাগজে বস্তু উপাদানে গঠিত 'কলবের' লাল বা নীল রঙের নকশা[১] আঁকিবে। ইহাতে اَللّٰهُ (আল্লাহ) শব্দটি সোনা বা রূপার পানিতে লিখিয়া উহার দিকেই তাকাইয়া থাকিবে, যেন এই নকশাটি তাহার হৃদয় প্রটে আঁকিয়া যায়।

---

১. ইহার নকশা হইল اَللّٰهُ

অথবা মনে মনে আল্লাহ্ শব্দটির নকশা আঁকিয়া ঐ দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিবে, যেন ক্রমে অদৃশ্য সত্তা তাহার অনুভূতিতে প্রতিভাত হইয়া উঠে।

কাদরিয়া শুগরে দাওরা পদ্ধতি ঃ সালিক আদব সহকারে দুই জানু হইয়া বসিয়া চক্ষু মুদিয়া রাখিবে এবং তালুর সহিত জিহ্বা মিশাইয়া একাগ্রতার সহিত اَللّٰهُ سَمِيْعٌ (আল্লাহু সামিয়ুন-আল্লাহ সর্বশ্যোতা)-এর ধ্যান করিবে। ধ্যানের ভিতরেই একটি রেখা নূরানী নাভি হইতে বাহির করিয়া বুকের মাঝখানে যেখানে লতীফা-এ সিরের অবস্থান সেইখানে লইয়া যাইবে। আর اَللّٰهُ بَصِيْرٌ (আল্লাহ বাসীরুন-আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা)-এর ধ্যান বুক হইতে বাহির করিয়া মস্তিষ্ক পর্যন্ত এবং اَللّٰهُ عَلِيْمٌ (আল্লাহু আলিমুন-আল্লাহ সর্বজ্ঞ)-এর ধ্যানকে উম্মুদিমাগ হইতে বাহির করিয়া আরশ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া পনুরায় অবরোহ পদ্ধতিতে আরশ হইতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত এবং আল্লাহ বসীরুনকে মস্তিষ্ক হইতে এবং আল্লাহ সামিয়ুনকে বুক হইতে নাভির দিকে লইয়া আসিবে। উহার পর পুনরায় নাভি হইতে শুরু করিবে এবং ক্রমান্বয়ে আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতি ইহাতে মশগুল থাকিবে। কেহ এই তরীকায় اَللّٰهُ قَدِيْرٌ (আল্লাহ কাদীরুন-আল্লাহ সর্বক্ষম)- এর ধ্যানকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। তাহারা বলেন ঃ 'আল্লাহ কাদীরুন'-কে চতুর্থ আকাশে এবং 'আল্লাহ আলীমুন-এর ধ্যানকে আরশ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া কমিয়া থাকিবে।

এই শুগলের উপকারিতা ও ফল লাভ হওয়ার পর সালিককে মুরাকাবার তালকীন করা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
কাদরিয়া তরীকার মুরাকাবাসমূহের বর্ণনা

'মুরাকাবা' শব্দটি 'রকীবুন' হইতে উদগত। আরবী ভাষঅয় রকীবুন'- এর অর্থ হইল নেগাহবান ও সংরক্ষক। সুতরাং মুরাকাবার অর্থ হইতেছে আল্লাহ ব্যতীথ অন্য সখল কিছু হইতে হৃদয়কে সংরক্ষিত রাখা। এই মুরাকাবার পদ্ধতি হইল, যে আয়াত বা কালিমার মুরাকাবা করিতে চাহিবে প্রথমে যবানে উহা উচ্চারণ করিবে। নিজেকে অত্যন্ত হীন ধারণা করিয়া আদব সহকারে কিবলার দিকে মুখ করিয়া দুই জানু হইয়া বসিবে এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকরের ধ্যান হইতে হৃদয়কে পবিত্র করিয়া মুরাকাবার প্রকৃত হাকীকতের ধ্যানে লিপ্ত হইয়া থাকিবে। হাদীস শরীফে উহার প্রকৃত হাকীকত সম্পর্কে বলিতে যাইয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করিবে যেন তুমি তাহাকে সামনে দেখিতেছ, আর তাঁহাকে যদি প্রত্যক্ষ করিত না পাও তবে ধারণা কিরবে তিনি তো তোমাকে দেখিতেছেন।'

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوْ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

অর্থাৎ সকল কিছুই বিলীন হইয়া যাইবে। কেবলমাত্র আল্লাহই বিদ্যমান থাকিবেন, যিনি অতি পরাক্রম ও সম্ভ্রমের অধিকারী'- কুরআনে করীমের এই আয়াতিট হইতেছে যেন সকল মুরাকাবার মূর ভিত্তি। ইহার পদ্দতি হইল, নিজেকে একেবারে মৃত, চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং মাটি বলিয়া ধারণা করিবে। আকাশকে বিদীর্ণ এবং পৃথবীকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ (কিয়ামতের দিন যেমন হইবে) বলিয়া ধ্যান করিবে আর আল্লাহর যাতকেই কেবল স্থায়ী ও বিদ্যমন বলিয়া ভাবিবে। যে পর্যন্ত না এই ধ্যানে তাহার পূর্ণ আত্মনিমগ্নতা ও বেভোলতার সৃষ্টি না হইয়াছে তাবৎ এই শুগলেই সে লিপ্ত থাকিবে। ইহা অর্জন হওয়ার পর সে অন্যান্য মুরাকাবার দীক্ষা লইবে।

দ্বিতীয় মুরাকাবা ঃ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ হইতেছেন নূর (আলো) আকাশ ও পৃথবীর'। এই আয়াত অনুসারে ধ্যান করিবে যে, আল্লাহ যেমন সকল স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছেন তেমন তাঁহার নূরও জগতের সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত।

বিশেষ বিশেষ আয়াতের মুরাকাবা পদ্ধতি ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন. اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ

অর্থাৎ, যে মৃত্যু হইতে তোমরা ভিগিয়া বেড়াও, নিশ্চয়ই তাহা তোমাদেরকে পাকড়াও করিবে। অন্য এক স্থলে ইরশাদ করেন ঃ

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

অর্থাৎ যে স্থানেই তোমরা থাক না কেন মৃত্যু অবশ্যই তোমাদেরকে আসিয়া পাকড়াও করিবে, শক্তিশালী কোন দালানে তোমাদের অবস্থান হউক না কেন।

উক্ত আয়াত দুইটির মুরাকাবা করিবে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য কালিমার মুরাকাবা করিতে চেষ্টা করিবে।

এই সমস্ত মুরাকাবা ও ধ্যানের উপকারিতা লাভের পর যখন বিভিন্ন অবস্থা ও আনওয়ার (জ্যোতি রাশি) প্রকাশ পাইতে থাকে তখন সালিককে 'মুরাকাবা-এ-তওহীদ'-এর তালীম ও দীক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে।

প্রথম ঃ মুরাকাবা-এ-তওহীদে আফআলী অর্থাৎ ক্রিয়াগত একত্বের ধ্যান ঃ ইহার তরীকা হইল বিশ্ব জাহানের যাবতীয় ক্রিয়াকান্ড অনন্ত সত্তা আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়া বলিয়াই ভাবিবে। বাহ্যত ঃ যাহাকে কাজ করিতে দেখা যাইতেছে তাহাকে শুধু মাত্র একটি মাধ্যম বলিয়া মনে করিবে আর আল্লাহ তা'আলাকেই ফায়িলে হাকীকী-প্রকৃত কারক ও কর্ত বলিয়া ভাবিবে। পূর্ণ পাবন্দীর সহিত এই ধ্যান করিতে থাকিলে অত্যাশ্চর্য ফল দেখিতে পাইবে। সুন্দরতম চারিত্রিক গুণাবলী তাহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইবে। ভাল মন্দের সীমারেখা হইতে বহু ঊর্ধ্বে সে তখন চলিয়া যাইবে।

কবির ভাষায়

জাগতিক বন্ধন মুক্ত যাহারা
ভাল মন্দের সীমার ঊর্ধ্বে তাহারা
ফানা'র সমুদ্রে দিয়াছে ডুব তাহারা
আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছু হইতে আলাদা তাহারা

দ্বিতীয় ঃ মুাকাবা-এ-তওহীদে সিফাতী অর্থাৎ গুণগত একত্বের ধ্যান ঃ ইহা হইল, বিম্বজগৎ এবং নিজের অসত্ত্বিকে আল্লাহর গুনসমূহের প্রতিবিম্ব মনে করা ও ইহারই ধ্যানে নিমগ্ন থাকা। এই মুরাকাবার উপকারিতাও লিখিয়া সম্পূর্ণ প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই মুরাকাবাকারী ব্যক্তি নিজেকে 'কাছরত ফীল আলম' বা জগৎ ব্যাপ্তির অনুভূতী দেখিতে পায়। নিজেকে সে বহু বিস্তৃত, বহু ব্যাপক হিসাবে প্রত্যক্ষ করে। যমীন হইতে লইয় আরশ পর্যন্ত সকল কিছুকে সে নিজের দ্বারা বেষ্টিত দেখিতে পায়। সমস্ত জগতের অস্তিত্ব সে নিজের মধ্যে দেখে। প্রতিটি জিনিসের মূল তাৎপর্য

তাহার সমক্ষে উদঘাটিত হইয়া যায়। আর এই কাশফ ও উদঘাটনে তাহার ভুল হয় না বরং উহা বাস্তবসিদ্ধ হইতে দেখা যায়।

কিন্তু এইখানেও সারিকের যাত্রা ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয় বরং অনন্ত ময়ের যাত সত্তার হিজাব ও পর্দাস্থিত আনওয়ার ও জ্যোতিরাশির দিকে সে আরো আগাইয়া যাইবে। কোন কোন সময় সে বিভিন্ন ধরনের নূর ও জ্যোতি উদ্ভাসিত হইতে দেখিতে পাইবে। এইগুলিকেও অনন্ত সত্তার হিজাব বা পর্দা বলিয়া মনে করিবে। পরম সত্তার দরবারে কাকুতি মিনতি সহকারে দোয়া করিবে এবং আরো আগাইয়া যাইতে প্রায়স পাইবে। এই সকল পর্দার পরও রহিয়াছে এক ধরনের জামালী ও লালিতিক পর্দা। এই ধরনের জামালী পর্দাসশূহ অতি সূক্ষ্ম এবং বর্ণহীন। এইখানে আসিয়া অনেক সময় ক্ষান্তি ঘটে। অনেকে ইহাকেই মূল উদ্দেশ্য বলিয়অ ধারণা করিয়া বসে, ফলে যাত্রা ক্ষান্ত হইয়া যায়। আল্লাহ্‌র সাহায্য যদি তাদের সহযোগী হয় তবে অতি সহজেই তাহারা এই স্তরও অতিরক্রম করিয়া যাইতে পারে এবং পরম সত্তার মারিফাত ও অভিজ্ঞান লাভের বিরল গৌরবে সুষমামণ্ডিত হইতে সক্ষম হয়। সুফীগনের পরিভাষায় ইহাকেই সায়ফীল্লাহ (অনন্তে অবগাহন) বলা হইয়া থাকে। এই স্তরের কোন শেষ নাই, কোন সীমা-সরহদ নাই। এই স্তরকেই সুলুক ও মারিফতের চরম স্তর বলিয়অ ধারণা করা হয়।

তৃতীয় মুরাকাবা ঃ সুঅভিজ্ঞ বুযুর্গগণ তওহীদে যাতী বা অনন্ত সত্তার একত্বের মুরাকাবা নিষেধ করিয়াছেন। 'তওহীদে যাতী' হইল, বিশ্ব জগতের সকল কিছুকে আল্লাহ বলিয়া ধারণা করা আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর কোন অস্তিত্ব নাই বলিয়া মনে করা। এই মুরাকাবা নিষিদ্ধ হওয়ার কাণ হইল, পরিপূর্ণ বোধ ব্যতিরেকে ইহার অভিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। মোট কথা ক্রমান্বয়ে ইনশাল্লাহ সকল কিছুই একদিন তাহার নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তবে প্রাথমিক অবস্থায় এই স্তরের অনুসন্ধানে পিছনে পড়িয়া যাইতে নাই।

ফা ঃ মুরাকাবার বেলায় মশ্‌ক ও পাবন্দীর প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। এমন অবস্থা যেন তাহার হইয়া দাঁড়ায় যে, ধ্যান হইতে মন সরান প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহাতে সে একাগ্রতা ও অনন্তময়ের সমক্ষ ধ্যান অর্জণ করিতে পারিবে। পরম সত্যময়ের অস্তিত্বময়তার ধ্যান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগতের অনস্তিত্ব তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। এক মুহূর্তের জন্যও এই ধ্যান হইতে বিচ্যুতি তাহার তখন প্রাণাশংকার কারন হইয়া দাঁড়ায়।

রোগমুক্তির যিকির ঃ ডান দিকে يَااَحَدُ (ইয়া আহাদু), বাম দিকে يَاصَمَدُ (ইয়া ছামাদু), আকাশের দিকে يَا وِتْرُ (ইযা বিতরু) এবং يَافَرْدُ (ইয়া ফারদু) এক হাজার বার পড়িবে।

রূহ ও ফেরেশতাগণের সাক্ষাত লাভের যিকির ঃ ডান দিকে سُبُّوْحٌ (সুরুহুন) বাম দিকে قُدُّوْسٌ (কুদ্দুসুন), আকাশের দিকে رَبُّ الْمَلٰئِكَةُ (রাবুল মালায়িকাতি), এবং কালবের উপর اَلرُّوْحُ (আররূহু)-এর এক হাজার জরব লাগাইবে এবং মূল মকসুদের প্রতি ধ্যানস্থ হইয়া থাকিবে। যেকোন রূহের সাক্ষাতলাভের ইচ্ছা হয় জাগ্রত বা নিদ্রায় সে তাহার সাক্ষাত লাভ করিতে পারিবে। উপরোক্ত যিকিরের দুই হাজার জরব লাগাইলে অতি শীঘ্র মাকছুদ হাছিল হয়।

ভবিষ্যত সংবাদ লাভ করার যিকির ঃ ডান দিকে يَااَحَدُ (ইযা আহাদু) বাম দিকে يَاصَمَدُ (ইয়া ছামাদু), কাঁধের দিকে মাথা ফিরাইয়া يَاحَيُّ (ইয়া হায়্যু) এবং দিলে يَا قَيُّوْمُ (ইয়া কায়্যুম)- এর জরব লাগাইবে। বালা-মসিবত দূরকরণের উদ্দেশ্য এই যিকির উল্লিখিত তরীকায় করা পরীক্ষিত একটি আমল।

মুশকিল জিনিস হাসিল করা এবং ভবিষ্যত সংবাদ জানার যিকির ঃ তাহাজ্জুদের নামযের পর এক হাজার বার করিয়অ ডান দিকে = (ইয়া হায়্যু), বাম দিকে يَاحَيُّ (ইয়া কায়্যুমু), আকামের দিকে يَا قَيُّوْمُ (হা ওয়াহ্হাবু) এবং দিলের উপর يَاوَهَّابُ (ইয়া আল্লাহু)- এর জরব লাগাইবে।

কাশ্‌ফে কুবুর বা কবরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়অর যিকির ঃ প্রথমে একুশ বার يَا اَللّٰهُ বলিবে। পরে আকাশের দিকে يَا رَبُّ (ইয়া রূহ), কবরে يَا رُوْحُ এবং দিরে يَارُوْحُ الرُّوْحُ (ইয়া রুহুররূহ)-এর জরব লাগাইবে। জাগরণেই হউক বা নিদ্রায় ইনশাআল্লাহ সে কবরের মৃত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ কবরের পার্শ্বে বসিয়া মৃতরে উপর ফাতিহা পড়িবে। পরে আকামেল দিকে চাহিয়া اُكْشُفْ لِىْ يَا نُوْرُ (উকশুফ লী য়া নুরু), দিলের উপর اُكْشُفْ لِىْ يَا نُوْرُ (উকশুফ লী ইয়া নুরু) এবং কবরের উপর حَالِهٖ عَنْ (আন্ হালিহী)-এর জরব লাগাইবে ও কালবের দিকে ধ্যানস্থ হইয়া থাকিবে।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রূহ মুবারক অবলোকন **করার যিকির ঃ** রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুরতে মিছালী (রূপক অবয়ব)-এর ধ্যান করিয়া দরূদ শরীফ পড়িবে। আর ডান দিকে يَا اَحْمَدُ(ইয়া ইহমাদু), বাম দিকে يَا مُحَمَّدُ (ইয়া মুহাম্মাদু) এবং দিলের উপর يَا رَزَّاقُ (ইয়া রাসূলুল্লাহ্)-এর এক হাজার বার করিয়া জরব লাগাইবে। জাগরণে বা নিদ্রায় যেকোন অবস্থায় হউক না কেন ইনশাআল্লাহ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত নসীব হইবে।

প্রয়োজন পূরণের যিকির ঃ কোন মুশকিলে পড়িলে বা প্রয়োজন দেকা দিলে 'আসমা-উল-হুসনা' অর্থাৎ আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ হইত উক্ত বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্যশীল কোন একটি নাম নিয়া তিন জরবী বা চারজরবী যিকির করিবে। যেমন অর্থকষ্ট থাকিলে يَا شَافِىُّ (য়া রাযযাকু), রোগমুক্তির জন্য يَا حَفِيْظُ (ইয়া শাফীয়্যু), দুশমনের দুশমনী প্রতিহত করার জন্য يَامُذِلُّ (ইয়া মুযিল্লু), বালা-মুসিবত দূর করার জন্য يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ (ইয়া হায়্যু য়া কায়্যুমু)। মোটকথা তাহার প্রয়োজনের সহিত খাপ খায় এমন কোন নাম লইয়া উল্লিখিত পদ্ধতিতে যিকির করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

নক্‌শাবন্দিয় তরীকার যিকির শুগলসমূহের বর্ণনা

আল্লাহর পথ অনুসন্ধানী কোন ব্যক্তি পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে এই তরীকার কোন বাযুর্গকে যখন আল্লাহকে পাওয়ার ওসীলা হিসাবে গ্রহণ কিরতে চাহে তখন সে ইস্তিকারা করিবে।[১] ইস্তিখারা করার পর দি অনুমতি হয় তবে সে এইপথে আগাইতে প্রয়াসস পাইবে। আর অনুমতি না হইলে অন্য চেষ্টা করিবে। কেননা, তখন স্পষ্ট হইয়া যাইবে যে অন্য কোন স্থানে হয়ত তাহার ভাগ্য বিজড়িত রহিয়াছে। পীর ও মুর্শিদের তওবাহও অনেক সময় ইস্তিকারার স্থানে গণ্য হয়।

ইস্তেখারা করার নিয়ম ঃ ইশার নামায বাদ নূতন ওজু করিয়া আ্তরিকতার সহিত একশত একবার পাঠ করিবে ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

(আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হওয়াল হায়্যুল কায়্যুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি)।

বাতেনী ও যাহেরী সকল প্রকার গুনাহ হইতে তওবা করিবে। ভাবিবে, আমি আজ যেন নূতন করিয়া আবার মুসলমান হইলাম। পরে এই উদ্দেশ্যে দুই রাকাত ইস্তিখারার নফল নামায পড়িবে যে, মুর্শিদের ওসীলায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শরীয়তের যথার্থ অনুগামী বানাইয়া দিন- এই কামনাই আমি করি।

খুব খুশু-খুজু-বিনয় ও ধ্যানের সহিত প্রথম রাকাতে 'আল-হামদু' পড়িয়া 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করিবে, আর দ্বিতীয় রাকাতে 'আলহামদু' পাঠ করার পর 'সূরা কাফিরুন' তিলাওয়াত করিবে। আল্লাহর দরবারে খুবই রোনাযারী করিবে। সালাম ফিরানোর পর একশত একবার কালিমা-এ-তামজীদ পড়ার পর হাত উঠাইয়া দু'আ করিবে। পরে ঘুম আসিলে ঐ স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িবে। ঐ স্থানের ----------

১. ইস্তখারা'র শাব্দিক অর্ত হইল মঙ্গল প্রার্থনা করা। সকল কাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহরই সম্যক জ্ঞান আছে। মানুষ নিজের ভবিষ্যত জানে না। তাই কোন কাজ শুরু করার পূর্বে ইহা তাহার জন্য ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহা আল্লাহর নিকট হইতেই তাহাকে জানিয়া লইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই হাদীসে নফলের নিয়াতে দুই রাকাত নামায পড়িয়া ইস্তিখারার দু'আ পড়ার বধান উল্লেখ হইয়াছে। পরে মূর গ্রন্থকার ইস্তিখারার দু'আ বিশদভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

শুইতে অসুবিধা থাকিলে যেখানে ইচ্ছা হয় সেইখানেই শুইয়া যাইবে। স্বরে যাহা তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে পীর ও মুর্শিদের নিকট তাহা বর্ণনা করিবে।

ইস্তিখারার সময় মনের ভাবের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। মনে যদি পূর্বের ন্যায়ই ঐ বিষয়ে মজবুত ও দৃঢ়তা থাকে তবে ভাবিবে উহাই তাহার জন্য পরম এক সুসংবাদ। মুর্শিদ তখন 'লাতায়িফে সিদত্তা' অর্থাৎ ছয় লতীফার মাধ্যমে তাহাকে 'ইসমে যাত' (আল্লাহ্)–এর যিকিরের এইভাবে তালীম দিবেন যে, সে তালুর সহিত জিহ্বা মিশাইয়া, চক্ষু মুদিয়া জাগতিক বস্তু উপাদানে গঠিত তাহার অন্তর হইতে মনে মনে উহা উচ্চারণ করিবে। আল্লাহর নাম ভিন্ন অন্য কিছু যেন তাহার ধ্যানে না আসে। উঠা বসা এবং যথা সম্ভব সকল অবস্থায়ই ঐ ধ্যান বজায় রাখিবে।

'লতায়কে সিত্তা' এবং উহাদের যিকির পদ্ধতি ঃ মানুষের শরীরে ছয়টি স্থান নূর ও বরকতের। এই ছয়টি স্থানকেই 'লাতায়িফ' এবং একবচনে লতীফা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

প্রথম ঃ লতীফা-এ-কালবী। বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নীচে হইল ইহার অবস্থান। ইহার নূর বা জ্যেঅতি লাল বর্ণের।

দ্বিতীয় ঃ লতীফা-এ রূহী। ডান স্তনের দুই আঙ্গুল নীচে হইল ইহার অবস্থান। ইহার নূর সাদা বর্ণের।

তৃতীয় ঃ নতীফা-এ-নাফস। নাভির নীচের ইহার অবস্থান। ইহার নূর হলূদ বর্ণের।

চতুর্থ ঃ লতীফা-এ-সিরী। বুকের মাঝে ইহার অবস্থান ইহার নূর সবুজ বর্ণের।

পঞ্চম ঃ লতীফা-এ-খফী। ভূর উপরে ইহার অবস্থান। ইহার নূর নীল বর্ণের।

ষষ্ঠ ঃ লতীফা-এ-আখফা। 'উম্মুদ্দিমাগ' হইতেছে ইহার অবস্থান। ইহার নূর হইতেছে চোখের মত কাল বর্ণের।

ফা ঃ এই ছয় লতীফা সম্পর্কে সা'রিকের এত বেশী যিকির হওয়া উচিত, যাহাতে সে এই যিকিরসমূহ সম্পর্কে সম্যক ভাবে ওয়াকিফহাল হইয়া উঠিতে পারে। পীর ও মুর্শিদ ছাহেব ও মুরীদের উক্ত লতীফাসমূহে ঐ যিকিরের প্রভাব সৃষ্টি করার প্রতি বিশেষ তাওয়াজ্জুহ দিবেন। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহর দরবারেও দু'আ করিবেন। জিহ্বাকে মুখের তালুর সহিত মিশাইয়া এবং উহা না নাড়াইয়া কলবের মাধ্যমে ইসমে যাতের যিকির আদায় করার

কলবের মাধ্যমে ইসমে যাতের যিকির আদায় করার নির্দেশ দিবেন। নিজেও তাহার প্রতি অবিচল একাগ্রতাসহ তাওয়াজ্জুহ দিবেন। স্বীয় কালবের মুখ মুরীগের কালবের প্রতি নিবদ্ধ ধ্যান করিয়া আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল কিছুর খেয়াল তাহার (মুরীদের) দিলে আসিতে বাধা প্রদান করার ধারণা লইয়া কালবকে ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে নিজের দিকে প্রবলবাবে আকর্ষণ করিবে, যেন এই তাওয়াজ্জুহ প্রদানের প্রবল ক্রিয়ায় মুরীদের লতীফাসমূহ আলোড়িত হইয়া উঠে এবং এইগুলির যিকির পূর্ণ ভাবে চালু হইয়া যায়। এইভাবে কম বেশী ঘণ্টাখানেক মুরীদের উপর তাওয়াজ্জুহ দিবেন। এই তাওয়াজ্জূহ প্রদানের শক্তি এই সিলসিলার বুহুর্গ ও ওহীদের অনুগ্রহ এবং তাওয়াজ্জুহতেই তাহার লাভ হইয়াছে-এই কথার ধারণা যেন তাহার মনে জাগরুক থাকে।

ফা ঃ জীবাত্মা হইল আল্লাহ্ তাআলার আলমে-আমর বা নির্দেশ জগত হইতে উদগত কালবে হাকীকী বা মানবাত্মার আবাসস্থল। ইহাকে 'হাকীকতে জামে' ও বলা হইয়া থাকে। আল্লাহ্র নিয়ম হইল, মুরীদ যখন স্বীয় কালবের প্রতি ধ্যানস্থ হয় তখন কালবে হাকীকী বা মানবাত্মার মাধ্যমে উহা ফয়জ ও গুণাবলীর মূল উৎস হইতে ফয়জ লাভ করিতে পারে।

লতীফা-এ-কালবীর পুরাপুরি মশক ও প্রশিক্ষণ লাভের পর এবং ফানা-এ-লবী বা আত্মার বিলীনতা অর্জিত হওয়ার পর অন্যান্য লতীফা পৃথক পৃথক মশ্ক করা কর্তব্য। ফানা-এ-লাতায়িক বা লতীফাসমূহের লীনতার অর্থই হইল লতীয়ার মধ্যে আত্মনিমগ্ন হইয়া যাওয়া এবং এই বিষয়ে কোনরূপ জড়তা ও ক্লেশ বাকী না থাকা।

লতীফাসমূহের মধ্যে মুরীদ কোন কোন সময় বিভিন্ন নূর ও তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে তাহার আত্মহারা হইতে নাই। বরং আল্লাহ্ তাআলাকে সব সময়ই পবিত্র এবং দোষমুক্ত বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে।

লতীফা-এ-কালবীর বেলায় নফী ও ইসবাতের সগীর-এরও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার পদ্ধতি হইল, চক্ষু ও ওষ্ঠ বন্ধ করিয়া নাবির নীচ হইতে শ্বাস লইয়া কালবের মাঝে আনিয়া গতিরুদ্ধ করিবে। 'লা' শবদটি নাভি হইতে বাহির করিয়া গলদেশ পর্যন্ত পৌছিয়া 'ইলাহা' শব্দটি গলদেশ হইতে 'লতীফা-এ-রূহী' পর্যন্ত নিয়া দিলের উপর এমন ভাবে ইল্লাল্লার জরব লাগাইব, যেন সব কয়টি লতীফাতে ইহার আচর অনুভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে

আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য সকল কিছুর অবলুপ্তি এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বশীলতার ধ্যান করিবে। প্রথম প্রথম প্রত শ্বাসে একবার করিয়া ইহা করিতে চেষ্টা করিবে। পরে ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা বাড়াইয়া প্রতি শ্বাসে একশ বার করিয়া ইহা আদায় করার প্রয়াস পাইবে। বেজোড় সংখ্যা হিসাবে ইহা আদায় করার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যিকির আদায় করার সময় ইহার জোয়ার ভাটার প্রতিও কেয়াল করিবে। ইহাতে এই যিকিরের প্রভাব পরিলক্ষিত হইতে পারিবে। যিকিরের যদি কোন আছর বা প্রভাব পরিলক্ষিত না হয় তবে বুঝা যাইবে যে এতক্ষণের যিকিরে তাহার কোন ফলোদয় হয় নাই। এই অবস্থায় পুনরায় তাহার এই যিকির শুরু করা উচিত।

যিকিরের প্রভাব হইল যে, নফী করার সময় (লা ইলাহা বলার সময়) যিকিরকারীর নিকট সকল মানবীয় অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হইয়া যায় আর ইসবাতের সময় (ইল্লাল্লাহ্ বলার সময়) 'জযবাতে-ইলাহী' বা খোদায়ী প্রেরণা যেন তাহার মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এমন একাগ্রচিত্তে এই যিকিরে লিপ্ত হওয়া ইচত যে, আল্লাহর যিকিরের যেন মনের মধ্যে সবচাইতে প্রাধান্য লাভ ঘটে এবং প্রেমাস্পদের নাম বিস্মৃত হইয়া তাহার অনন্ত জালওয়ার মধ্যেই যেন সে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকে।

ছয় লতীফার শুগল বর্ণনা ঃ নাভি হইতে শ্বাস ল্য়া যে লতীফার যিকির করিতে তাহার বাসনা হয়, সেই লতীফার কাছে আসিয়া গতিরুদ্ধ করিবে এবং যতটুকু সম্ভব ইসমে যাত (আল্লাহ্)-এর অর্ত ঐ স্থানের নূর ও ওয়াসিতায় মাধ্যামের ধ্যানসহ 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' যিকিরে মশগুল হইয়া যাইবে। এই ইসম (নাম)- কে আল্লাহর সত্তা-বহির্ভূত বলিয়া ধারণা করিবে না। কেহ কেহ এই মাকামসমূহের যিকির 'হাবসে-দম' পদ্ধতি অবলম্বন ব্যতিরেকেই করিয়া থাকেন।

তবে তাহারাও ঐ ইসমে-যাত (আল্লাহ্)-এরই যিকির করিয়া থাকেন।

যিকরে জারূব পদ্ধতি ঃ লতীফাসমূহের মাধ্যমে এই যিকির করার পদ্ধতি হইল-যে লতীফা হইতে এই পদ্ধতির যিকির করিতে বাসনা হইবে সেই লতীফা হইতে ইসমে যাত আল।লাহর ধ্যানসহ সজোরে শ্বাস লইয়া এবং এই শ্বাস কোথাও রুদ্ধ না করিয়া পুনরায় ঐ লথীফার উপরই 'হু' শব্দটির জরব লাগাইবে। যেমন কেহ যদি লতীফা-এ-কালবের জারূব পদ্দতির যিকির করিতে চায় তবে ইসমে যাত (আল্লাহ্ শব্দটি)-এর ধ্যান করিয়া কালব হত্রিতহৈ সজোরে শ্বাস লইয়া রূহ পর্যন্ত টানিয়া পুনরায় কালবের উপরই 'হু' শব্দটির জরব লাগাইবে। এমনিভাবে অন্যান্য লতীফার বেলায়ও তাহাই করিবে।

যিকরে আর্রা পদ্ধতি ঃ এই লতীফাসমূহের মাধ্যমে ইহার পদ্দতি হইল-যে লতীফা হইতে ইহা করার বাসনা হয়, ইসমে-যাতের ধ্যানসহ ঐ লতীফা হইতে সজোরে উলটা শ্বাস লইয়া উহাতেই পুনরায় 'হু' শব্দটির জরব লাগাইবে। লতীফা-এ-কালবের যিকরে জারূব পদ্ধতি বর্ণনাকালে উপরে ইহার উদাহরণ বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই ছয় লতীফার প্রত্যেকটির মশ্‌ক হওয়ার পর এবং ইহাতে পূর্ণতা প্রাপ্তির পর মুরীদের সবুগুলি লতীফার উপর একই সঙ্গে স্বীয় তওয়াজ্জুহ্ প্রদানের অনুরোধ করা কর্তব্য। নিজেরও এই দিকে খুবই তাওয়াজ্জুহ্ দান করা উচিত। ইহাতে অতি সহজে লতীফাসমূহ জারী হইয়া যাইবে। লতীফাসমূহের এই মশক করার পথে যদি কিছু তাজ্জালী ও নূর প্রকাশ পাইতে দেখে তবে ইহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বেপরোয়া হইয়া যাওয়া সা'লিকের জন্য উচিত নহে। বরং সব সময়ই তাহার মধ্যে উন্নতির তীব্র আগ্রহ থাকিত হইবে।

ফাঃ সূফীগনের পরিভাষায় লতীফাসমূহের এই মশক পথকে সায়র-এ-পাতায়িক বা লতিফাসমূহের যাত্রাপথ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া তাকে। আর এই মশক যখন পূর্ণাঙ্গ হয় তখন ইহাতে 'সুতনুয্‌যিকর' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

সুলতানুল-আযকার পদ্ধতি ঃ মুরীদ পা হইতে মাথা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি লোমকূপের প্রতি তাওয়াজ্জুহ্ করিয়া ইসমে যাতের ধ্যান করিবে। পীর সাহবেও প্রতিটি অঙ্গের প্রতি তাওয়াজ্জুহ্ প্রদান করিবেন। পরে এমন ভাবে যিকিরে লিপ্ত হইবে যে, শরীরের প্রতিটি লোম যেন যিকিরে মাতোয়ারা হইয়া উঠে। তাহার এমন অবস্থা হইবে যে, এই দিক হইতে ধ্যান সরাইতে চাহিলেও যেন সে ইহার শক্তি না পায়।

'ছয় লতিফার' সহিত সংশ্লিষ্ট আলোচনা এতক্ষণ হইতেছিল। কাদরিয়া সিলসিলার মাশায়িখ বুযুর্গগণের নিকট এই পথে মন্‌যিলে মকসুদে পৌঁছিতে হইলে কেবলমাত্র সাতটি কদমের প্রয়োজন। ইহার কালব, লুহ্, সির, খফী, আখফা এই পাঁচটি হইতেছে 'আলমে আমর বা নির্দেশ জগতের জিনিস আর নফস এবং কালিব (শারীরিক কাঠামো) এই দুইটি হইতেছে 'আলমে খালক' বা সৃষ্টি জগতের জিনিস। কালিব বা মানুষের শারীরিক কাঠামো চারটি উপাদানে (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস) গঠিত। এই হিসাবে লতীফা হইতেছে সর্বমোট দশটি। এই তরীকার পীর বুযুর্গপণ সর্ব প্রথম আলমে আমরের জিনিস কালব হইতে সালিক বা মুরীদের যাত্রা শুরু করাইয়া থাকেন। আর লতীফা এ কালিব অর্থাৎ শরীরের চারটি মৌল উপাদানকে নফ্‌ত্মে সহিত সমাধা করাইয়া দেন। ইহার পর তাহারা মুরীদকে নফী ও ইসবাত (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) এর যিকির শিক্ষা দেন।

নফী ও ইসবাতের যিকির পদ্ধতি ঃ বেলায়েত ও কামালাত (বুযুর্গী ও রুহানী গুণাবলী) এবং এই তরীকার মূল ভিত্তিই হইতেছে এই নফী ও ইসবাত যিকির। ছয় লতীফার মাধ্যমে ইসমে-যাতের (আল্লাহর) যিকির করার প্রচলন হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী কৃর্তক প্রবর্তিত একটি তরীকা।

নফী ও ইসবাতের শুগল পদ্ধতি ঃ চক্ষু মুদিয়া জিহ্বাকে তালুর সহিত মিলাইয়া নাভির নীচ হইতে শ্বাস টানিয়া মস্তিষ্ক পর্যন্ত লইয়া আসিবে। 'লা' শব্দটি নাভি হইতে টানিয়া 'উমুদ্দিমাগ' (মস্তিষ্কের মধ্য) পর্যন্ত টানিয়া সেইখান হইতে 'ইলাহা' শব্দটি 'লতীফা-এ-রূহ'-ত্ম দিকে নিয়া দিলেল উপর ইল্লাল্লার জরব লাগাইবে। লা ইলাহা'-এর সময় আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য সকল কিছুর নফী (অস্তিত্বহীনতার)-এর ধ্যান করিবে আর 'ইল্লাল্লাহ্' বলার সময় আল্লাহর ইসবাতের (অস্তিত্বশীলতার) খেয়াল করিবে। প্রাথমিক স্ত রের সালিক 'লা মাবুদা ইল্লাল্লাহ্' (আল্লাহ ব্যতীথ কেহ উপাস্য নাই), মাধ্যমিক স্তরের সালিক 'লা মকসূদা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কিছু মকসূদ বা উদ্দেশ্য নাই), আর শেষ স্তরের সালিক লা মওজুদা ইল্লল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই)– এর ধ্যান করিবে। প্রতি শ্বাসে অনধিক একুশ বার এই যিকির করিবে। এই যিকিরের আছর অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন সকল কিচু হইতে সম্পর্ক হীনতা যদি তাহার মনে পয়দা হইতেছে দেখিতে পায়, তবে আল্লাহর শুকর আদায় করিবে। আর ইহার কোন আছর অনুভূত না হইলে পুনরায় প্রথম হইতে উহা শুরু করিবে, যাহাতে সে ইহার প্রভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

নকশবন্দীয়া তরীকার অধিকাংশ মাশায়েখের নিকট এই পর্যন্তই হইতেছে সুলুকের সীমা। ইহার পর হইতেছে মুরাকাবা (ধ্যান)-এর স্তর। এখন ইহার বর্ণনা করার ইচ্ছা রাখি। প্রথমে মুরীদকে ফানা-এ-আফআল (তওহীদে আফ' আলীর মুরাকাবা বলিয়াও ইহাকে অভিহিত করা হইয়া থাকে)- এর শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে।

তওহীদে আফআলীর মুরাকাবা পদ্ধতি ঃ ইহার পদ্ধতি হইল মুরীদ বা সালিক স্বীয় কর্মাবলী এবং সকল সৃষ্টিকে আল্লাহর কর্মেরই প্রকাশ বরিয়া ধারণা করিবে। আল্লাহকে সকল কর্মের মূল কর্মকর্তা বলিয়া বাবিবে। ইহাতে আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল কিছু কর্তৃত্বের ধারণা বিলীন হইয়া যাইবে।

ইহার পর ফানা-এ-সীফাত (যাহাকে তওহীদে সীফাতী বলিয়াও অভিহিত করা হয়)- এর মুরাকাবা শিক্ষা দান করিবে। এই মুরাকাবায় নিজের এবং সকল সৃষ্টি সকল প্রকার গুণ আল্লার গুণাবলীতে লীন বলিয়া ধ্যান করিবে।

ইহাতে সে كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا (আল্লাহ বলেন ঃ আমিই নৈকট্য লাভকারী বান্দা রকান ও চক্ষু হইয়া যাই)- এই হাদীসটির বাস্তব নিদর্শন হইয়া দঁড়াইবে।

ইহার পর ফনাা-এ-যাতী (ইহাকে তাওহীদে যাতীর মুরাকাবা বলিয়াও অভিহিত করা হইয়া থাকে) এর মুরাকাবা বা ধ্যান শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার পদ্ধতি হইল-সর্বতোভাবে নূর-ই নূর বলিয়া পরিজ্ঞাত কালবে-হাকীকী (মূল মানব-হৃদয়)-কে প্রত্যক্ষ করিয়া নিজেকে এবং সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ্-সত্তার প্রকাশ বলিয়া ধ্যান করিবে। আল্লাহ ভিন্ন কোথাও আর কছুই যেন সে প্রত্যক্ষ না করে। এই ধ্যান হইতে মুহূর্তের জন্যও সে যেন গাফি না হয়, অমনোযোগী না হয়। যদি কখনো ধ্যান সরিয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সতর্ক হইয়া যাইবে এভং পনুরায় এই দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিবে। আল্লাহর মুশাহাদা ও প্রত্যক্ষ নূর দর্শনে সে যেন তখন বুদ হইয়া যায় এবং স্বীয় সত্তা ও সকল সৃষ্টি যেন তাহার নিকট বিলুপ্ত হইয়া যায়।

জানিয়া রাখা দরকার যে, এই নিসবত বা রূহানী সম্পর্ককে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ করার পথে পীর ও বুযুর্গগণের কেহ কেহ 'যিকিরে কাওয়ারীর' এর শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহা হইল সকল কিছুর আধার মূল সত্তা আল্লাহ্ তা'আলাকে সূর্যে রমত আর ককল সৃষ্টিকে কাঁচের মত মনে করিবে এবং এই ধ্যান করিবে যে কাঁচ সদৃশ এই সৃষ্টি ঐ সূর্যের মুখামুখী প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার আলোতেই এই (সৃষ্টি) আলোকিত। এই সৃষ্টিতে ঐ নূর ও আলা ভিন্ন অন্য কিছু নাই। এই মুরাকাবা পদ্ধতিতে পূর্ণতা অর্জন করিতে পারিলে সে সকল সৃষ্ট বস্তুতেই মহান সৃষ্টিকর্তাকে ব্যাপ্ত দেখিতে পাইবে এবং এইগুলির (সৃষ্টি বস্তুসমূহের) প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নাই বলিয়া মনে করিবে।

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (যে নিজেকে চিনিতে পারিয়াছে সে তাহার প্রভুকেও চিনিতে পারিয়াছে)-এই বাচনটিও ঐ কথারাই সাক্ষ্য বহন করে। এই পর্যায়ে সালিক পরম প্রিয় সত্তার পত্যক্ষ দর্শন এবং সংসর্গে অবস্থানের দরুন প্রতিটি জিনিসেই পরম হককে দেখিতে পায়। সূফীগণের পরিভাষায় এই অবস্থাকে 'তওহীদে ওজুদী' (অস্তিত্বের একত্ব) বলা হইয়া থাকে।

আলমে-আমর (নির্দেশনা জগত)-এর বস্তু লতীফা-এ-কালবীর সহিত জড়িত জিনিস হইতেছে বেলায়েতের স্তর। অর্থাৎ এই লতীফা হইতেই বেলায়েতের স্তর শুরু হয়। আল্লাহ্ ভিন্ন সকল কিছুর চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করার পর আল্লাহর অনন্ত জামাল ও সৌন্দর্যরাজি প্রত্যক্ষ হইতে থাকিলে এই স্তরেক তওহীদে শুহুদা (সমক্ষদর্শন একত্ব) বলা হইয়া তাকে। এই পর্যায়ে বেলায়েতের সম্পর্ক হইতেছে 'রূহে-আযম' (শ্রেষ্ঠতম রুহ) বা অবিমিশ্রি এক নূর-এর সহিত।

বেলায়েতের উল্লিখিত উভয় স্তর ওলীগণের জন্যই খাস। এই স্তরে পৌঁছিতে পারিলে সালিক ইলমে লাদুন্নী (আল্লাহর নিকট হইতে সরাসরি প্রাপ্ত জ্ঞান) এবং কুতুব ও আবদাল হওয়ার সম্মান লাভ করিতে পারে।

এই নিসবত পরিপর্ণ হওয়ার পরও এই সমস্ত তাজাল্লী ও মুশাহাদার স্বাদ লাভে বিভোর হইয়া থামিয়া পড়া উচিত নহে বরং তাহাকে আরো উন্নয়ন প্রত্যাশী হইতে হইবে। এই পর্যায় যদিও বেলায়েতের কামাল ও চরম স্তর তবু ইহাতেও শিরকের কিছুটা আঁচ বিদ্যমান। পরম লক্ষ্য আল্লাহ তা'আলাকে সকল প্রকার শিরকের সংমিশ্রণ হইতে উর্ধ্বে রাখিয়াই লাভ করিতে হইবে।

ইহার পর মুরীদের উচিত পীর ও মুর্শিদের তাওয়জ্জুহের ওসীলায় নিজেকে এই সকল তাহ্জালীর মুশাহাদা এবং ইচ্ছা হইতে (ইহা যত সূক্ষ্মই হউক না কেন) পবিত্র করিতে হইবে। সকল খেয়াল ও ধারণা এবং চিন্তা হইতে (হক হউক বা বাতল) নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবে। আর পীর ও মুর্শিদের তালকীন ও পরামর্শানুযায়ী 'মুরাকাবা-এ-নায়াফ্ত ও মুরাকাবা-এ ওয়ারা-উল-ওয়ায়' মশগুল হইয়া থাকিবে।

মুরাকাবা-এ-নায়াফ্ত পদ্ধতি ঃ লতীফা-এ-সিরীকে উল্লিখিত খেয়াল ও ধারণাসমূহ হইতে মুক্ত করিয়ো ইহাতে বাতেনী দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে সকল জাগতিক বিষয় হইতে আল্লাহকে পাক পবিত্র বলিয়া ধ্যান করিবে; যাহাই তাহার ধারণায় নিপতিত হয় তাহা সকলের চেয় পবিত্র ও দিকহীন, বর্ণহীন পরম সত্তার নিকটেই মাগিবে। পরম প্রিয় ভিন্ন আর কাহারো প্রতি যেন তাহার দৃষ্টি না থাকে। নূরে ইয়াকীন (সুপ্রত্যয়তিক জ্যোতি) আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন সকল কিছু হইতে যেন সে বেখবর হইয়া উঠে। এইভাবে সে পবিত্রতার চরম স্তরের দিকে যেন উন্নতি করিয়া যাইতে থাকে এবং আর কোথাও যেন সে তামিয়া না পড়ে।

কবি বলেন ঃ

হে ভ্রাত, এই দরবারের কোন শেষ নাই, সীমা নাই।
হে স্তরেই তোমার ধারণা হইতে পরমত সেখানে,
সেখানে তহাকে পাইবে না।
বরং তিনিই আরো ঊর্ধ্বে, আরো ঊর্ধ্বে।

আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল কিছুর নফী বা অস্বীকৃতির যখন প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়। তাওয়াজ্জুহ এবং ধ্যানের মাধ্যমে লতীফা-এ-সিরীর কাঁচ সচ্ছ ও উজ্জ্বল যখন হইয়া উঠিবে তখন নায়াফ্ত, ওয়ারা-উল-ওয়ারা (ঊর্ধ্বেরও ঊর্ধ্বের) এবং বেলায়েতে আখচ্ছ বা বিশিষ্টতর বেলায়েত (যাহা কেবলমাত্র ফেরেশতা ও নৈকট্য লাভ কারিগণেরই মর্যদা)- এর সুমহান মর্যাদা লাভ হইয়া উঠে।

লতীফা-এ সিরীর সহিতই এই বেলায়েতের সম্পর্ক
আল্লাহর অনুগ্রহ যাহার সঙ্গী
সে-ই কেবল পায় এই মহান নিয়ামত

লতীফা-এ-সিরীকে মুরীদ যখন সকল তাজাল্লী (মুশাহাদার তাজাল্লীই বা হউক না কেন) হইতে সমুক্ত করিয়া তুলিতে পারে তখন সে দায়িরা এ-হাকীকী বা মৌল পরিমণ্ডলে যাইয়া প্রবেম কিরতে সক্ষম হয় সকল হাকীকত ও মৌল তাৎপর্য সম্পর্কে অনবহিত থাকা রদরুন সে অবশ্য অজ্ঞই থাকিয়া যায়। আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য ও নুছরত যদি তাহার আশ্রয় হিসাবে থাকে তবে সে সকল বস্তু উপাদান এবং নূরানী ও জ্যোতিময় স্তরসমূহ একে একে অতিক্রম করিয়া যাইতে থাকিবে এবং নায়াফ্ত ও ওরা-উল-ওরার স্তরও অতিক্রম করিয়া হাকীকতে নায়াফত ও বেলায়েতে আখাচ্ছুল-খাওয়াচ্ছ (বিশিষ্টেরও বিশিষ্টতর বেলায়েত)- এর স্তর (যাহা নবীগণের বেলায়েতের স্ত র) তাহার নিকট উদঘাটিত হইয়া উঠিবে। মন-ইস্তষ্ককে আল্লাহর মিলন বা বিচ্ছেদের ধারণা হইতে পবিত্র করার মাধ্যমেই এই নিসবত অর্জিত হয়।

মোটকথা, বেলায়েত খাস যদিও বেলায়েতের একটি স্তর তবু ইহাতে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যদেরও অস্তিত্বে ধারণা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। প্রকাশমান এবং প্রকাশস্থলের পার্থক্য তখনো বিদ্যমান পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাতে এবং ইহার পিঠাপিফ ঊর্ধ্ব-স্তরসমূহেও কিছু না কিছু শিরকের আঁচ পাওয়া যায়; বেলায়েতে আখছ্ছেও গায়রুল্লাহ হইতে পবিত্রতা বিদ্যমান। এইখানে সালিক স্বীর মরতবা, গুণাবলী এবং পূর্ণতাকে আল্লাহরই পূর্ণতা ও গুণাবলীর প্রকাশ বলিয়া কেবল ধারণা করে।

কোন মকিছুতেই সে আল্লাহর প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু প্রত্যক্ষ করে না এবং কেবল তাহারই পবিত্রতা সে বর্ণনা করে। তবে এই কথ াসত্য সে সমস্ত মানুষের পবিত্রতার ধ্যান আম্বিয়া-এ-কেরাম আলআহিমুস সালামের পবিত্রতার ধ্যানের সামনে খুবই নগণ্য মর্যাদা রাখে। মন সকল কিছুর এককত্বে ধারনা (যাহা তাহাদের নিকট বাথির বলিয়া বিবেচিত) হইতেও পবিত্র। অনুরূপভাবে আল্লাহর অন্য কিছু হইতে পবিত্রতার ধারণা হইতেও পাক। যাতা হউক, নিজের মন, মস্তিষ্ককে অন্য সকল কিছুর ধ্যান হইতে মুক্ত করিতে থাকিবে আর ঊর্ধ্ব হইতেও ঊর্ধ্ব স্তরে উন্নতির আকাঙ্খা পোষণ করিবে। ক্রমে দিকহীন ও বর্ণহীন তাজাল্লীর ধারায় তাহার মন প্লাবিত হইয়া উঠিবে এবং সনাতন ও অনাদি সত্তার নূরে তাজাল্লীতে সে সমুজ্জুল হইয়া উঠিবে। মনকে অন্য জিনিস হইতে যে পরিমাণে সে মুক্ত রিতে পারিবে তদনুসারে বেলায়েতের পরিমণ্ডলও তাহার প্রবেশাধিকার অধিক হইবে।

ইহার পরের স্তর হইতেছে 'কামালাতে আম্বিয়া' বা নবীগণের পূর্ণত্ব ও গুণাবলী প্রাপ্তির স্তর। এই স্তরের মূল তাৎপর্য ও গুরুত্ব র্বণনা কখনো সম্ভব নহে। বিদগ্ধ গবেষকগণ বলিয়াছেন, নবীগণের বেলায়েত এবং তাহাদের নবুওয়্যাত দুইটিই তাহাদের স্বতন্ত্র মৌল গুণের মধ্যে গণ্য। উভয়টিই অন্যটির সম্পর্ণূ প্রতিবম্বি হওয়া হইতে পবিত্র। তবে এতভদুয়ের মধ্যে পার্থক্য হইল যে, বেলায়েতের মাধ্যমে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা ভেদে অনন্ত সত্তার তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ 'এই নবীগণ, ইহাদের একজনকে আরেকজনের উপর আমি মর্যাদা দিয়াছি।'

এই নিসবত ও দরজায় পূর্ণতা অর্জন করিতে পারিলে মাঝ হইতে ধ্যান ও মুলাহাজার পরদাও বিলুপ্ত হয়িা যাইবে এবং হুযুর দর হুযুর (আল্লাহ তাআলাকে সময় সময় প্রত্যক্ষ দর্শন) ও নূর-আলানূর (যাহা বাকা বিল্লাহর স্তর)-এর স্তরে যাইয়া উপনীত হইবে।

নক্শবন্দিয়া তরীকার যিকির শুগলসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইখানে উল্লেখ করা হইল। বিস্তারিত বিবরণ জানার কাহারো আগ্রহ হইলে হযরত মাওলানা নিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝান্ঝান্ভী (রা)–এর বিশিষ্ট খলীফা মওলানা শায়খ মুহাম্মদ ফারুক থানভীর লিখিত রচনাসমূহ পাঠ করিতে পারেন। তরীকা-এ-আহমদিয়ার শুগলসমূহ বর্ণনায় মওলানা শায়খ আবদুল আহাদ

ছাহেবের কয়েকটি পুস্তিকা রহিয়াছে। তন্মধ্যে 'কুহলুল জাওয়াহির' নামক পুস্তিকাটিখুবই ভাল। এই তরীকার সুলূকের স্তরসমূহ অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে হযরত শাহ আহমদ সায়ীদ দেহলভী (র)-এর রচিত পুস্তক 'আহারে আরাবাআ' খুবই ভাল।

কতিপয় পরিভাষা

এখন এখন কতিপয় পরিভাষা সম্পর্কে লিখার ইচ্ছা রাখি, যেগুলির উপর নকশবন্দিয়া তরীকার ভিত্তি বিদ্যমান।

হুঁশ দরদম, নজর বর কদম,সফর দর ওয়াতান, কিলওয়াত দর আন্ জুমান, ইয়দা কারদ, বাযগাশত, নিগাহদাশত, ইয়াদ দাশ্ত, ওয়াকূফ যমানী, য়াকূফে আদবী, ওয়াকূফে কালবী এই এগারটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত এবং এইগুলি স্বয় লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য।

হুঁশ দর দম র্থ লইল, নিজের সম্পর্কে সর্বদা সজাগ এবং হুঁশিয়ার তাকা। আল্লাহর যিকির হইতে উদাসীনভাবে একটি শ্বাসও যেন নির্গত না হয়। ইহার মাধ্যমে তাফরিকা-এ-নাফসী অর্থাৎ মনের বিশৃংখল চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ সম্ভব হয়।

নজর বর কদর অর্থ হইল, আসা যাওয়া সকল অবস্থা দৃষ্টি পায়ের দিকে রাখিবে। ইহাতে দৃষ্টির বিভ্রম ও বিশৃংখলা হইতে মুক্তি পাওয়া যায় এবং মনের একাগ্রতা লাভ হয়। শুরুতে মন দৃষ্টির অধীনে থাকে। তাই দৃষ্টির পেরেশানীর আছরে মনও পেরেশান এবং বিশৃংখল হইয়া যায়।

নজর বর কদম দ্বার াজাগকি জীভনের পরিক্রমা এবং স্বয় স্বার্থবাদিতার ময়দান শীঘ্র অতিক্রম করিয়া যাওয়ার দিকেও হয়ত ইঙ্গিত হইতে পারে। যেখানেই তাহার দৃষ্টি শেষ হইয়া যায় সেখানেই যেন সে তাহার পা রাখে।

সফর দর ওয়াতান অর্থ হইল সালিক বা খোদাপথ যাত্রী মানবীয় স্বভাব অতিক্রম করিয়া যাইবে। অর্থাৎ মন্দ স্বভাবগুল প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুণাবলীর মাধ্যমে পরিবর্তিত করিয়া লইবে। তাখাল্লাকু বিআখ্লাকিল্লাহ (আল্লাহর চরিত্রে চিরত্রবান হও)– এর মর্ম ইহাই।

খিলওয়াত দর আঞ্জুমান অর্থ হইল, বাহ্যত তাহার বসবাস মানুষের সহিত হইবে কিন্তু আভ্যন্তরীণভাবে তাহার অবস্থান হইবে আল্লাহর সহিত। অর্থাৎ সর্বাবস্থায়ই সে আল্লাহর প্রতি ধ্যান রাখিবে।

ইয়াদ কারদ অর্ত হইল, কালবী ও যবানী (অন্তরে ও মুখে) যিকিরের সহিত থাকা। অর্থাৎ আল্লাহরস্মরণের মাধ্যমে মনের গাফলত ও উদাসীনতাকে দূর করা।

বাযগাশ্‌ত অর্থ হইল, মুখে যতবার কালিমা-এ-তায়্যবার উচ্চারণ করিবে মনে মনে মততবারই দুই করিবে, হে আল্লাহ্, আপনার সন্তুষ্টি অর্জনই আমার একমাত্র মকসুদ। আপনার খাতিরেই আমি দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কিছু পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনার অনুগ্রহ, আপনার মহান দরবার আমাকে পৌঁছার তওফীক দিন। যিকির হইতে তাহাকে কখনো উদাসীন হইলে চলিবে না। ইহাও বড় একটি শর্ত।

নিগাহ দাশ্‌ত অর্থ হইল মুরাকাবা-এ-কালব। অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল কিচুর ধ্যান হইতে দিরকে মুক্ত রাখা। এক শ্বাসে একশত বার কলিমা-এ-তায়্যবা পাঠ করিবে। গায়রুল্লাহর দিকে যেন খেয়াল না হয়। এমনকি আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতিও যেন লক্ষ্য না থাকে। যাওয়াদাতে মুতলাক এবং ওরা-উল-ওরা সত্তার প্রতিই যেন মাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।

ইয়দা দাশ্‌ত হইল, সব সময় এবং সর্বাবস্থায়ই আল্লহার প্রতি ধ্যান নিবদ্ধ রাখা। কেহ কেহ হুযুরে কারব (মনের মাঝে সর্বদা আল্লাহর-উপস্থিতি)-কেই ইয়াদ দাশ্‌ত বরিয়া অবিহিত করিয়া থাকেন। মুহাক্কিক বুযুর্গগণ বলেন, জাতী মুহাব্বতের মাধ্যমে আলত্মহার অস্তিত্ব ও উপস্থিতির ধ্যান অন্তরে প্রবল হওয়ার নাম হইল ইয়াদ দাশ্‌ত। ইহার নামই মুশাহাদা বা আল্লহার প্রত্যক্ষ দর্শন। সত্য বলিতে কি, এই মাকাম (আল্লহার প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। সম্পূর্ণরূপে স্বীয় সত্তাকে বিলীন করা এবং বাকা-এ-কামিল পরিপূর্ণ সত্তার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ ভিন্ন অন্য কোনরূপে ইহা অর্জন করা সম্ভব নহে।

ওয়াকুফে যমানী অর্থ হই, সর্বদা নিজের প্রতি তীক্ষ্ম খবরদারী রাখা। আল্লাহর আনুগত্যে সময় ব্যয় হইরে মুকর আদায় করিবে, আর পাপের মধ্যে লিপ্ত হইলে তওবা ও অনুশোচনা করিবে। এমনিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিও লক্ষ্য রাখিবে যে ইহা আল্লাহর সমক্ষ দর্শনের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতেছে না গাফেলী বা উাদাসীনতার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইতেছে। তদ্রূপভাবে কবজ ও বসত[১] অবস্থায় আল্লাহর শুকর এবং ইস্তেগফার করিবে। ইহাকে মুহাসাবাও বলা হইয়া থাকে।

---

১. ইবাদতে মন লাগার অবস্থাকে বসত এবং মন না লাগার অবস্থাকে কবজ বলা হয়।

ওয়াকূফে আদবী অর্থ হইল, নফী ও ইসবাত যিকিরের সময় বেজোড় সংখার প্রতি লক্ষ্য রাখা। কলবী যিকিরের বেলায় সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিরে মনের পেরেশানী বিদূতির হয়।

ওয়াকূফে কালবী অর্থ হইল, যিকিরকারী আল্লাহ সম্পর্কে যেন সর্বদা ওয়াকিফহাল থকে। অতবা ইহার অর্ত হইল, আল্লাহর সমক্ষে মনকে এমন ভাবে হারি রাখা যে আল্লাহ ভিন্ন অর্ত কিছুর সহিত বিন্দুমাত্র সম্পর্কও যেন না থাকে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, যিকির করার সময় সজাগ এবং আল্লাহর সহিত সম্পর্ক বিরাজমান থাকা উচিত। মুহইক্কক বুযুর্গগণ বলিয়াছেন, সত্যান্বেসীর মনে যদি কালবী যিকিরের আছর পরিলক্ষিত না হয় এবং উহা স্থায়ী না হয় তবে পীর ও মুর্শিদ তাকে যিকির বন্ধ করিয়া ওয়াকুফে কালবীর তালীম দিবেন। উহাতে শীঘ্র যিকিরের প্রভাব অনভূত হইবে।

পীর ও মাশায়েখের তাসার্‌রুফ (ক্রিয়া ক্ষমতা প্রদর্শন) ও তাওয়াজ্জুত পদ্ধতি

সকল ধরনের বিষয় হইতে পীর ও মুর্শিদ স্বীয় অন্তরকে কালি করিয়া মুরীদের মনে যে নিসবতের ইল্‌কা (বর্ষণ) করিতে চাহেন সেইদিকে মুতাওয়াজ্জুহ হইয়া স্বীয় অন্তরের তাওয়াজ্জুহকে মুরীদের প্রতি নিবদ্ধ করিবেন। ধ্যান করিবেন, আমার জয়বার আছর মুরীদের অন্তরেও পড়িতেছে। ইহাতে ইনশাল্লাহ যোগ্যতানুসারে নূর ও বরকত হাসিল হইবে।

এইভাবে মুরীদের লতীফা-এ-কালবকে সক্রিয় করার পর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য লীফা প্রতিও পীর সাহেব তাওয়াজ্জুহ দিবেন। এমনভিাবে মরুরীদের অন্তরে মুরাকাবা ও লীতফাসমূহে নূররামির ইল্কা করার প্রতি তাওয়াজ্জুহত দিবেন। মুরীদ-যদি সামনে উপস্থিত না থাকে তবে গায়েবানা তাওয়াজ্জুহ দিয়া তাহার উপকার করিতে সচেষ্ট হইবেন।

অসুস্থতা বিদূরণ পদ্ধতি ঃ পীর ও মুর্শিদ সকল প্রকার চিন্তা ও ধারণা হইতে নিজেকে পাক করিয়া মুরীদ যে অসুস্থতায় ভুগিতেছে নিজেকে সেই সেই রোগে আক্রান্ত বলিয়া খেয়াল করিবেন। ইহাতে ঐ রোগ মুরীদের শরীর হইতে তাহার দিকে চলিয়া আসিবে। মানুষের মধ্যে ইহা আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর একটি অত্যাশ্চর্য প্রতিরূপ।

অসুস্থতা বিদূরণের এবং পাপ হইতে তওবা নসীব হওয়ার দ্বিতীয় তদবীর ঃ আল্লাহর সহিত পূর্ণ সম্পর্কের অধিকারী পীর ও মুর্শিদ ওজু করিয়া দুই রাকাত নফল নামায পরিড়বেন এবং পরে দরূদ ও ইস্তেগফার পাঠ করিয়া একান্তে বিনয় ও কাতরতা এবং খুশু-খুজুর সহিত দুই করিবেন আল্লাহ্ পাক যেন অসুস্থ ব্যক্তির অসুস্থতা ও পাপীর পাপসমূহ বিদূরিত করিয়া দেন। অতঃপর ঐ অসুস্থ ও পাপীর সামনে ধ্যানস্থ হইয়া বসিবেন এবং সজোরেশ্বাস টানিয়া ধ্যান করিবেন। অসুস্থ ব্যক্তির অসুস্থতা পাপ বা পাপসমূহ যেন টানিয়া লইয়া আসিতেছেন আর শ্বাস ত্যাগের সময় দারণা করিবেন যে, ঐ ব্যক্তির অসুস্থতা বা পাপসমূহ ভূমিতে পতিত হইতেছে। ইহাতে ইনশাল্লাহ অসুস্থ বক্তি সুস্থ হইয়া উঠিবে এবং পাপী বক্তিরও পাপ হইতে তওবা করা নসবী হইবে।

জীবিত বা মৃত আল্লাহওয়ালাগণের নিসবত সম্পর্কে অবিহত হওয়ার তরীখা ঃ ঐ বক্তি যদি জীবিত হন তবে তাহার সম্মুখে বসিবে আর মৃত হইলে তাহার কবরের সামনে বসিবে এবং নিজেকে সকল প্রকার নিসবত হইতে মুক্ত মনে করিয়া আল্লহা রাব্বুল আলামীনর দরগায় দু'আ করিবে, হে আলীশ (সর্বজ্ঞ), যে খবীর (সর্ব অবহিত সত্তা), হে মুবীন (স্পষ্ট কর্তা) আমাকে এই বুযুর্গ সম্পর্কে বিহত করুন, ইহার বাতেনী হাল আমাকে জ্ঞান করুন। পরে ঐ ব্যক্তির রূহের প্রতি ধ্যানস্থ হইবে এবং কিছু সময়ের জন্য তাহার রূহের সহিত স্বীয় রূহ মিলাইয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ পর নিজের দিকে মুতাওয়াইজ্জাহ হইবে। নিজের মধ্যে যদি হালের কিছু বৃদ্ধি-পলিলক্ষিত হয় তবে বুঝিবে ঐ বুযুর্গেরই প্রকৃত নিসবত। মনের ভাবনাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পদ্ধতিও ইহাই।

মনের খাতরাত অর্থাৎ ধারণা সম্পর্কে অবিহতি হওয়ার পদ্ধতি ঃ স্বীয় কলবকে সকল ধারণা খেয়ালাত ও কল্পনা হইতে শূন্য করিয়া তাঁহার দিকে ধ্যানস্থ হইবে। পরে ভাল মন্দ যে ধারণাই মনে সৃষ্টি হইবে তাহা ঐ ব্যক্তির তরফ হইতেই সৃষ্টি বলিয়া মনে করিবে।

ভবিষ্যত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া পদ্ধতি ঃ সকল ধরনের ভাবান হতি দিলকে খালি করিয়অ আল্লাহর দরবারে দু'আ করিবে, হে আল্লাহ, হে আলীম, হে খরীর, হে মুবীন এই ঘটনা স্মপর্কে আমাকে অবহিত করুন। ইহার পর সকল ধরনের খেয়ার হইতে যদি মুক্ত দেখিতে পায় এবং পিপাসাত ব্যক্তির যেমন পানির তরি আগ্রহ থাকে এই ঘটনাটি জানার জন্য যদি সে ধরনের তীব্র আগ্রহ সে অনুভব করে তবে সে ক্ষণে ক্ষণে স্বীয় রূহকে মালা-এ-আলা (ঊর্ধ্ব জগত) অবস্থা ভেদে মালা-এ-আসফাল (অধঃজগত) এর

দিকে পূর্ণ হিম্মতের সহিত ধ্যানস্থ রাখিতে প্রয়াস পাইবে। ইহাতেগায়বী আওয়াজের মাধ্যমে বা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইয়া বা স্বপ্নে এই ঘটনা সম্পর্কে 'আল্লহা চাহেনত' সে অবহিত হইতে সক্ষম হইবে।

বালা-মুসীবত দূর করার উপায় ঃ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আশয়কাকৃত মুসীবতটির কল্পিত রূপের খেয়াল করিবে এবং এই মুসীবতিটির বিদূরণের প্রতি তাওয়াজ্জুহ সহ ধ্যান করিবে। আল্লহার মদদ ও সাহায্যে ইনশাআল্লাহ এই মুসীবত দূর হইয়া যাইবে।

এই ধরনের অলৌকিক ব্যাপারসমূহ সাধারণত মধ্যম ধরনের সালিকদের হইয়া থাকে। আর যাঁহারা এই পথের পরম স্তরে যাইয়া উপনীত হইয়াছেন তাঁহাদের তরফ হইতে এই ধরনের অলৌকিক ব্যাপার সাধারণত ঃ খুব কমই সংঘটিত হইয়া থাকে। কারণ, দুনিয়ার প্রতি তাঁহারা অতি অল্পই লক্ষ্য দিয়া থাকেন।

জানিয়া রাখা উচিত যে, আরিফ বুযুর্গগণের কাশফ ও ইলহামের প্রত্যেকটিই সত্য এবং বাস্তব হইবে এমন কোন কথা নহে। কারণ, অসম্ভাব্য কোন বিষয়ের উপর এই কাশফ ও ইলহামের ভিত্তি নাই বরং যন্নী বা সম্ভাবনার উপর ইহার ভিত্তি। ইহা ভুলও হইতে পারে। কোন কোন সময় ইহা মূল ঘটনার বিপরীত হইয়াও প্রকাশ পআতে পারে। তাই যেকোন লোকের সম্মুখে এই কাশফ ও ইলহামের প্রকাশ করা উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ এবং অন্যান্য আমলের বর্ণনা

সুলুক ইল্লাল্লাহ-আল্লাহকে পাওয়ার পথে তিনটি বিষযে শিক্সা গ্রহণের প্রতি সবিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রথমঃ কলিমা-এ তায়্যবা, লা লিাহা ইল্লাহল্লাহ মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ-এর যিকির। দ্বিতীয় কুরআন করীমের তিলাওয়াত। তৃতীয় নামায। বাকী অন্যান্য বিষয় এইগুলিরই কোন না কোন একটির অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন, হাদীস এবং সাহাবা-এ কেরামের আলোচনা দ্বারা উক্ত বিষয়সমূহের ফযীলত ও মর্যাদা সুপ্রমাণিত এই নাতিদীর্ঘ পুস্তিকাটিতে ইহার বর্ণনা সঙ্গব নহে। এইগুলির অসুীশ ও অগণন বরকত ও ফযীলতসমূহের বর্ণনাও মানুষেল ক্ষমতার বাহিরে।

সত্যিকারের তালিব (খোদা অন্বেষু ব্যক্তি)-এর জন্য কারিমা-এ-কায়্যিবার ফযীলত জানিয়া নেওয়া উচিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে কারিমা-এ-তায়্যিবা হইতেছে, লা ইলাহা-এর মাধ্যমে সকল কিচুকে অস্বীকার করিয়া ইল্লাল্লার মাধ্যমে পরম প্রিয়তমের সহিত একাকার হইয়া যাওয়া। কুরআন করীমের ফযীলত স্মপর্কে এতটুকু জানিয়া রাখাই যথেষ্ট যে, ইহার তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লহার দরবারে হুযুরী (উপস্থিতি) এবং তাহার সহিত কথা বলার সুযোগ হয়। নামাযের মধ্যে উল্লেখিত দুইটি জিনিসহ আছেই অধিকন্ত ন্যান্য দুআ তসবীহ এবং ইবাদতও ইহাতে বিদ্যমান। ইহার মর্যাদাও অগণন। মানুষের পক্ষে ইহার স্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব নহে। আত্ম তন্ময়তা এবং আন্তরিক আগ্রহ-প্রেরণার প্রবৃদ্ধি ব্যতিরেকে যে মুসলিম নামায আদায় করে সে ইহার অনেক বরকত ও মরতবা ইহাতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। এমনি কি ইহার মূল উদ্দেশ্য পর্যন্ত অনেকের লাভ হয় না। নামায আল্লাহ এবং নন্দার মাঝে এক মহান সেতুবন্ধন। ইহার মাধ্যমে মুসলিম আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল কিছু হইতে দূরে এবং একমাত্র আল্লাহর নিকটবর্তী হইয়া থাকে।

কালিমা-এ-তায়্যিবর সহিত যে সুলুক পদ্ধতির সম্পর্ক ছিল, এই বিসয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন কুরআন তিলায়াত এবং নামায সম্পর্কিত সত্যান্বেষী বুযুর্গগণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছা রাখি।

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের নিয়ম ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা মহান একটি ইবাদত। ফরয বিষয়সমূহ ব্যতীত ইহার চাইতে উত্তম ও বড় ইবাদত আর কিছুই নাই। ইহার মুস্তাহাব ও আবাদসমূহ হইল ঃ

তাহারাত ও পাক-পবিত্রতা হাষির করার পর, পূর্ণ ইখলাস ও আন্ত রিকতার সহিত কাবার দিকে মুখ কিরয়া আউযু-বিসমিল্লাহ পাঠ করিয়া খুশু-খুজু, বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতার সহিত তরতীল[১] সহকারে তিলাওয়াত শুরু করিবে, ধ্যান করিবে, আল্লাহর সিহত আমি কথা বলিতেছি। তাহাকেই আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। এতটুকু ধ্যান করা যদি মুশকিল হয় তবে এই ধ্যান করিবে যে আল্লাহ আমাকে দেখিতেছেন। তিনি নিষেধাজ্ঞা ও অনুজ্ঞা সম্বলিত নির্দেশ দিতেছেন। সুসংবাদ সম্বলিত আয়াত তিলাওয়াাতের সময় উৎফুল্ল হইবে। ধমকী এবং ভীতির আয়াত তিলাওয়াতের সময় ভীত হইবে। বিপগলিথ হৃদয়ে অশ্রুপাত করিবে। সুইচ্চ আওয়াজে, সুললিত কণ্ঠে (যেভাবে পাঠ করিলে তাহার আনন্দ লাগে এবং অমনোযোগিতা বিদূরিত হয়) তিলাওয়াত শুরু করিবে। এই হইল সাধারণ তিলাওয়াত পদ্ধতি।

ইহার বিশেষ তরীকা হইল, উল্লেখিত তরীকাসমূহের প্রতি ত লক্ষ্য রাখিবেই।

১। অদিকন্তু নির্জনে যেকাবেন অন্য কেহ বাদা সৃষ্টি করতে না পারে এমন এক স্থানে আদব সহকারে দুই রাকাত নফল নাময পড়িয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া বসিবে। কুরআন শরীফ সামনে রাখিয়া আল্লাহর কালামের বড়ত্ব ও নিজের হীনতার কথা খেয়াল করিবে এবং জাহেরী ও বাতেনী আদবের মশক করবে। অতঃপর মশ্‌কের আদব আলোচনা করিবে। সাধারণত আদব পূর্বেই মুখস্থ করে রাখবে। সকল ধরনের খেয়াল হইতে মনকে মুক্ত করিয়া কুরআনের হাকীকত ও মূর তাৎপর্যের (যে ইহা আল্লাহর নাফসী অর্থাৎ ধ্যানগত কালামের গুণ) প্রতি ধ্যানস্থ হইবে এবং কিছুক্সণ এই ধ্যানেই অতিবাহিত করিবে যেন ইহাতে তাহার ইত্‌মিনান ও মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হইয়া যায় আর ছাত্র যেমন শিক্ষকের সামনে অবস্থান করে তেমনি ধরনের তাহারও হুযরে হক আল্লহার সমক্ষে অবস্থান মূরত ইসজীব হইয়া উঠে। পরে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পূর্ণ পাঠ করিয়া তরতীল এবং তাজবীধ (কেরাত তেলাওয়াতের নিয়ম প্রণালী)

---

১. তরতীল বলা হয় এমনভাবে পাঠ করা, যেন প্রতিটি হরফ আলাদা আলাদা স্পষ্টভাবে যথাস্থান হইতে সুন্দর আওয়অজে উচ্চারিত হয়।

সহকারে শিক্ষক যেমন ছাত্রের সম্মুখে পাঠ করে সেইভাবে তিলাওয়াত শুরু করিবে। তিলাওয়াতের সময় কেরাত পাঠের যাবতীয় নিয়ম প্রণালী যথাযতভাবে আদায় করিতে গিয়া কোনরূপ ত্রুটি হইতে দিবে না। মুখের যবানের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক মনের যবানেও ইহা পাঠ করিতেছে বলিয়া ধ্যান করিবে। এই ধ্যান হইতে বিন্দুমাত্র গাফেল বা উদাসীন হইবে না। যদি কখনো উদাসীনতা আসিয়াই যা তবে তৎক্ষণা 'আউু বিল্লাহ' পড়িয়া পুনরায় হাযির করিয়া লইবে।

২। এই ধ্যানের মশ্‌ক করার মাধ্যমে যখন তাহার পূর্ণ মানসিক স্থিতি এভং হুযুরি-এ-হক (আল্লাহর সম্মুখে অবস্থানের ধ্যান) অর্জিত হইয়া যাইবে তখন সে এই ধ্যান করিবে শরীরের প্রতিটি লোমকূপ যেন কুরআন তিলাওয়াত করিতেছে। তাহার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে যেন এই তিলাওয়াতের আওাজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। হযরত মূসা তূর পাহাড়ে আল্লাহ্‌র সহিত কালাম (কথা) বলার সময় সেইখানে অবস্থিত বৃক্ষটি হইতে যেমন কালামের শব্দ বাহির হইতেছিল তেমনিভাবে এইখানে শরীরের সকল স্থান হইতে ঐ বৃক্ষের মতই তিলাওয়াত করার সময় তিলাওয়াতের আওয়অজ বাহির হইতেছে এই ধ্যানেই আত্ম নিমগ্ন হইবে।

৩। এই ধ্যানের পূর্ণতা লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারিলে পরে ধ্যান করিবে যে, খোদ আল্লাহ পাক আমার যবান দ্বারা ইহা পাঠ করিতেছেন এবং তিনি ইহা শুনিতেছেন। খেয়াল করিবে, আল্লাহ এই পাঠকে খোদ তাঁহারই কর্ণে শ্রবণ করিতেছেন।

৪। ইহাতে পূর্ণতা অর্জনের পর ধ্যান করিবেন আল্লাহ নিজেই পাঠ করিতেছেন এবং নিজের কর্ণেই ইহা শ্রবণ করিতেছেন। মাঝে এই তিলাওযাতকারী এবং পৃথিবীর অন্য কিছুর কোনই অস্তিত্ব থাকিবে না। তাহার ধ্যান হইত সকল বিলুপ্ত হ্‌য়িা যাইবে। সকল দিক হইতে কেবলমাত্র ঐ একটি আওয়াজই গুঞ্জরিত হইতে শুনিবে। আর ইহাতেই সে আত্মবিমোহিত হইয়া থাকিবে।

উপসংহার ঃ এই স্তরে যখন সে পূর্ণতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে, তখন আশা করা যায় যে, কুরআন করীমের মূল তাৎপর্য ও রহস্য তাহার সামনে উদ্‌ঘাটিত হইয়া উঠিবে এবং সে স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হইতে সক্ষম হইতে পারিবে।

নামায পদ্ধতি ঃ সালিক খোদার পথযাত্রীর উচিত প্রতিটি আমরে বিশেষ করিয়া নামাযের মধ্যে স্বীয় রূহ (মন ও মস্তিষ্কের) হেফাজত করা। (ইহার অর্থ হইতেছে আন্তরিক ভালবাসা, খালিয নিয়্যত, আল্লাহর সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহারই ধ্যানে আত্মবিভোর হইয়া থাকা।) মূল হাকীকত পূর্ণ ও তাৎপর্য অনুসারে নামাজ আদায় করা আহলে হাকীকত বা মৌল তাৎপর্যের অধিকারী সতআতগণেরই কাজ। ইহা যথযথবাবে আদায় করা এবং ইহার মূল হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছা খুবি মুশকিল এবং কষ্টকর সত্য, তবে সাহস না হারাইয়া নিয়ত চেষ্টা করিয়া যাওয়া উচিত। ইহাতে আল্লাহ্ পাক এই কাজ তাহার পক্ষে সহজ করিয়া দিবেন বলিয়া আমা করা যায়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ আর যাহারা আমার পথে সাধনা করিবে, নিশ্চয়ই আমি তাহাদেরকে আমার পথসমূহ দেখাইয়া দিব।

নামায আদায় করার তরীকা হইল, প্রথমে নামাযের একটি রূপক ছবির খেয়াল করিবে। ধারণা করিবে, নামাযের দিল হইল খালিস নিয়্যত, ইহার রূহ হইল হুযুরে ক্বালব বা একাগ্রতা, ইহার শরীর হইতেছে রুকু, সিজদা ইত্যাদি আমল। ইহার প্রধানত অঙ্গ হইল রুকনসমূহ আর ধীরে ধীরে আদায় করা এবং শুদ্ধ কিরয়া কেরাত পদা হইল ইহার ইন্দ্রীয়। এইগুলির কোন একটি যদিনা হয় তবে আল্লাহর ওয়ালীগণের নিকট ঐ নামায শুদ্ধ নামায বলিয়া বিবেচ্য হইবে না। নামাযের জন্য সম্পর্ণ পরিবত্রতা অর্জনও জরুরী, কেননা, ইহা ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয় না। আর মনের পবিত্রতা হইতছে আল্লহা ব্যততীত অন্য সকল কিছু হইতে মনকে মুক্ত করা। কেননা, আল্লাহর অনুগ্রহ দৃষ্টি এবং তাঁহার কবুলিয়্যাত (গ্রহণ করা)-এর সম্পর্ক কেবলমাত্র মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা এবং আমলের প্রতিই লক্ষ্য করন না, বরং (মূলতঃ) তোমাদের হৃদয় এবং নিয়্যতের প্রতিই লক্ষ্য করেন না, বরং (মূলতঃ) তোমাদের হৃদয় এবং নিয়্যতের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকেন।" সুতরাং গায়রুল্লাহর প্রতি দৃষ্টি থাকার দরুন ক্বালবই যখন অপবিত্র, তখন তাহার শরীর কেমন করিয়া পবিত্র হইতে পারে? কেননা শরীর ক্বালবের অধীন। সুতরাং আল্লহা ভিন্ন সকল কিছু হইতে দিল ও জানকে পবিত্র রাখা উচিত। আল্লহা ব্যতীত আর কাহারো বড়ত্বের ধ্যান যেন না থাকে; আর কাহাকেও যেন সম্মান প্রদর্শনের যোগ্য বলিয়া না ভাবে। এই সময় তাহারা 'আল্লাহু আকবর' (আল্লাহ মহান) বলা শুদ্ধ হবে। নামাযের তকবীরে জন্য

হাত উঠাইবার সময় খেয়াল করিবে যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহান হইতে আমি বিমুক্ত। وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী এই দু'আ পাঠ করার সময় হিম্মতের সহিত ক্বালবের মুখ আল্লহার দিকে ফিরাইয়া রাখিবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্ হামদুলিল্লাহ্) পড়ার সময় খেয়াল করিবে বিশ্বজগতে প্রসংসার যোগ্য আর কেহ নাই। যাবতীয় প্রশংসা মূলত ঃ আল্লাহার দিকেই ফিরিয়া যায়। رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (রাব্বুল আলামীন) পাঠ করিবার সময় ধারণা কিরবে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন প্রভু নাই। اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (আর রাহমানির রাহীম) পড়ার সময় আল্লহার অসীম দয়া ও অনুগ্রহের আশা পোষণ করিবে এবং ক্বালবের মধ্যে এই বিষয়টি গাঁথিয়া নিবে। مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (মারিকি ইয়াওমিদ্দীন) পড়ার বেলায় মনে ভয়ের সঞ্চার করিবে এবং কিয়ামত দিবসের কথা খেয়াল করিবে। 'আল-আমরু ইয়াওমাইযিলি লিল্লাহ' অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেবলমাত্র আল্লাহর নির্দেশ চরিবে-এই খাতর ধ্যান করিবে। اِيَّاكَ نَعْبُدُ (ইয়্যাকা না'বুদু) পাঠ করার সশয় 'লা মজুদা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো অস্তিত্ব নাই) এই কথার মুরাকাব করিবে। وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (ইয়্যাকা নাস্তায়িন) পাঠ করার সময় ধ্যান করিবে লা ফায়িলা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লহা ব্যতীত আর কাহারও কিছু করার নাই। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (ওয়া ইহ্দিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম) পাঠ করার সময় আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার যাত্রাপথের ধ্যান করিবে। صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলায়হিম) পড়ার সশয় খেয়াল করিবে যে, ঐ পথ ছিল আম্বিয়া ও আওলিয়া-এ কেরামের। আল্লাহর নিকট এই পথ লাভের যাচঞা করিবে। غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ (গায়রিল মাগযূবে আলআহিম ওলায্যাল্লীন) পাঠ করা রসময় আল্লাহর গযব ও পথভ্রষ্টতা হইতে পানাহ চাহিবে। দাঁড়ানোর সময় শরীয়ত ও তরীকতের উপর দৃঢ় হইয়া থাকার আশা পোষণ করিবে। রুকু করার সশয় আল্লাহর বড়ত্ব এবং নিজের বিনাশনের কথা আর 'তাশাহ্হুদ' অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার সময় স্বীয় তন্ময়তার ধ্যান করিবে।

নামাযে যাহা পাঠ করিবে নিজের জীবনে তাহা প্রয়োগ করার প্রয়াস পাইবে। আ তাহা না হইলে সে فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ (অর্থাৎ যে ব্যাক্তি আল্লহার উপর মিথ্যারোপ করে এবং সত্যকে অস্বীকার করে তাহার চাইতে জালিম এবং সীমালংঘনকারী আর কে আছে?) এই আয়াতোক্ত ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

হুযুর (একাগ্রতা) এবং ইখলাস সৃষ্টির প্রয়াস পাইবে। প্রত্যেকে নামাস পড়ার পরই চিন্তা করিয়া দেখিতে ইহাতে কোন ক্রটি হইল কিনা। হুযুরে কালব বা একাগ্রতার অভাব দেখিরে বা অন্য কোন রূপ ক্রটি হইতে দেখিলে পুনরায় ইহা দুহরাইয়া পড়িবে। কয়েক দফা এমন করিতে পারিলে مَنْ طَلَبَ وَجَدَّ وَجَدَ (কেহ যদি কোন কিছু অন্বেষণ করে এবং উহার জন্য চেষ্টা করে সে উহা পাইয়াই থাকে) এই প্রবচনটির বক্তব্যানুযায়ী সুনিশ্চিত রূপে আমা করা যায় যে, সে মকসুদ লাভ করিতে পারিবে। তবে এতটুকুই যথেষ্ট মনে করিয়া অলস হইয়া থাকিবে। না বরং সর্বদা নামাযের ধনাত্মক গুণাবলী অর্জনের প্রয়াসী থাকিবে। ইহাতে ইনশাআল্লাহ নামাযের প্রকৃত তাৎপর্য এবং আল্লাহ তা'আলাকে লাভ করিতে সফল হইতে পারিবে। কবি বলেন ঃ

কাজ হাসল না হওয়া পর্যন্ত
হইব না কখনো ক্ষান্ত
হয় সফলকাম হব আর না হয়
দিব প্রাণ বিসর্জন।

এই মনোভাব নিয়া দৃঢ়চিত্তে কাজ করিয়া যাও, আল্লাহর অনুগ্রহে ইনশাআল্লহা এই পথে সফলকাম হইতে পারিবে।

নামায আদায়ের দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ নামায পড়ার সময় কালবের মুখকে হাকীকতে কা'বা (কা'বার মূর তাৎপর্য যাতা আল্লাহ তাঅলার অস্তিত্বশীলতার প্রতীক)-এর দিকে করিয়া নামাযের নূরে হাকীকত (জ্যোতি তাৎপর্য তাহা আল্লহার উলুহিয়্যাত অর্থা, উপাস্য হওয়ার প্রতীক)-এর ধ্যান করিবে। বিনয় ও আযীযীর সহিত স্বীয় হাকীক ও আবদিয়্যত (দাসত্বের) এর ধ্যান করিয়া গোলামীর খালিস নিয়তের সহিত নামায শুরু করিবে। তাকবীরে তাহরিমার জন্য হাত উঠাইবার সময় খেয়াল করিবে, বিশচজগতের সক কিচু হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহর প্রতি আমার মুখ ফিরাইয়া লইলাম। اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ আকবর) বলা রসশয় ধারণা করিবে, নাফসকে তকবীরের ছুরি দিয়া জবাই করিয়া ইহাকে বিলীন করিয়া নিলাম। তাসবীহ (সুবহানাকা আল্লাহুম্মা) এবং তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) পাঠ করিয়া কেরাত শুরু

করিবে। ধারণা করিবে, আল্লহা তা'আলা আমার এই পাঠ কবূল করিয়া নিতেছেন। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইয়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, বান্দা যখন 'আলহামদু লিল্লাহ' পাঠ করে তখন আ।ললহা তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করিতেছে, যখন সে 'আর রাহমানির রাহীম' পাঠ করে তখন আল্লহা বলেণ, আমার বান্দা আমার বড়ত্ব বর্ণনা করিতেছে। আর যখন 'ইয়্যাকানা' বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্ত ায়ীন' পাঠ করে তখন আল্লহা বলেন, ইহা আমি এবং আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত। সে আমার নিকট যাতা চাহিবে তাহা সে পাইবে। পরে বান্দা যখন পাঠ করে 'ইহদিনাছ সিরাতাল মুস্তাকীমা সিরাতাল লাযীনা আনআমতা আলাইহিম গায়বিল মাগযূবি আলাইহিম ওলায্যাল্লীন' তখন আল্লহা বলেন, ইহা আমার বান্দার জন্য, তাযা সে আমার নিকট যাঞ্ছা করিয়াছে (অর্থাৎ হেদায়েত) তাহাকে সেই জিনিস প্রদান করা হইল। আল্লাহ তা'আলার এই জবাবাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহাতে তন্ময় ইহয়া থাকিবে। রুকু করার সময় পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিবে এবং আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব আর নিজের হীনতার কথা ধ্যান করিবে। সিজদা করার সময় নাকের ডগার দিকে দৃষ্টি রাখিবে এবং আল্লাহ্‌র সুউচ্চ মর্যাদা ও নিজের নীচতা ও দীনতার কথা ধ্যান করিবে। বসা অবস্থায় বুকের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং আত্তাহিয়্যাতু-এর অর্থের পতি খেয়াল রাখিবে। ধ্যান করিবে আল্লাহর স্মুখে আম্বিয়া-এ কেরামের দরবারে যেন সে এই সময় প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। প্রত্যেক নামাযেই تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ (এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তাহাকে তুমি দেখিতে পাইতেছ-এই হাদীসটির মর্মের প্রতিও ধ্যান রাখিবে। আর নামাযে যদি অন্য কোন কেয়াল আসিয়া পড়ে তবে لَاصَلٰوةَ اِلَّا حُضُوْرِ الْقَلْبِ অর্থাৎ মনের একাগ্রতা ব্যতীত নামায হয় না-এই কথার ধ্যান করিয়া ঐ খেয়াল বিদূরিত করিবে। এতটুকু উচ্চ আওয়াজে কেরাত পড়িবে যেন নিজে বা পার্শ্বের জন মাত্র শুনিতে পায়। এত বুলন্দ আওয়অজ করিবে না যে, উহা বাহিরের লোকদের কানে যাইয়াও পৌঁছে। তবে জাহিরী নামাযে (অর্থাৎ যে সমস্ত নামাযে কেরাত সশব্দে পড়িতে হয়) নিশ্চয়ই কেরাত উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করিবে।

নামায আদায়ের অন্য একটি পদ্ধতি ঃ নির্দিষ্ট শর্তাবলীসহ নামায আদায় করিবে। নামাযের হালতে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দৃষ্ট নূরে হাকীকতের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিবে। দাঁড়ান অবস্থায় সিজদার স্থানে, রুকুর অবস্থায় পায়ে, সিজদার অবস্থায় নাকের ডগায় এবং বসা অবস্থায় বুকের প্রতি পক্ষ নিবদ্ধ রাখিয়া ভাব তন্ময় হইয়া নামায আদায় করিবে। এই ভাবে পুনঃ পুঃ মশ করিতে থাকিলে আল্লাহর মদদ ও মেহেরবানীতে নামাযের হাকীকত ও মূল তাৎপর্য ইনশাআল্লাহ হাসিল কতি সক্ষম হইবে। বিভিন্ন ধরনের হাকীকত ও মারেফতের দ্বার তাহার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া উঠিবে। ইহাই হইতেছে 'আসসালাতু মিৎরাজুল মু মিনীন' (নামায মুমিনগণের মে'রাজ)-এর স্তরর। আসল উদ্দেশ্য ও মকসুদই হইতেছে দুনিয়া ড়াং ইহার যাবতীয় সকল কিছু হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আল্লহা তা'আলার সহিত মিশিয়া যাওয়া। যাহাকে ইচ্ছা করেন আর্‌লহা পাক তাহাকে এই নেয়ামতে বিভূষিত করিয়া থাকেন। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং আমাদের সকল বন্ধুবান্দব ও সকল সত্যান্বেষীকে এই মহান মর্যাদায় বিভূষিত করুন। এই অবস্থায়ই আমাদের মওত দিন এবং পুনরুত্থান করুন। তাহার অনুগ্রহ ও করম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, তাঁহার বংশধর ও সাহাবীগণের রহমত ও ওসীলায় তিনি আমাদের এই দু'আ কবূল করিয়া নিন। আমীন! আমীন !! আমীন!!!

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্বপ্নে যিয়ারত লাভে তরীকা ঃ বাদ এশা সম্পূর্ণ পাক-সাফ হইয়া নূতন কাপড় পরিধান করিয়া সুগন্ধি লাগাইবে এবং আদব সহকারে মদীনা শরীফের দিকে মুখ করিয়া বসিবে। জামালে মুকারক আঁ হযরত সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত (দর্শন) লাভের জন্য কায়মনে দু'আ করিবে। মনকে সকল প্রকার ধ্যান হইতে খালি করিয়া সাদা ঝকঝকে কাপড় এবং সবুজ পাগড়ী পরিহিত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্দর চেহারা ও অবয়বের ধ্যান করিবে।

ডান দিকে اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (আসসালাতু আসসালামু আলায়কা ইয়া রাসূলুল্লাহ), বাম দিকে اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ

عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ (আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ), এবং দিলের উপর اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ (আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ)-এর জরব লাগাইবে। যত পরিমাণ সম্ভব বিরামহীনবাবে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। অতঃপর বেজোড় সংখ্যা হিসাবে যত পরিমাণ সম্ভব নিম্নের এই কালামটি পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاهُ ـ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আরা মুহাম্মাদিন কামা আমারতানা আন নুসাল্লিয়া আলায়হি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা হুয়া আহ্লুহু আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বাহু।)

অর্থ ঃ হে আল্লাহু, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ নাযিল করুন যত পরমাণ আপনি আমাদেরকে তাঁহার উপর দরূদ পাঠ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ নাযল করুন যত পরিমাণ দরূদের তিনি হকদার। হে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ নাযিল করুন, যত পরিমাণ আপনি ভালবাসেন এবং যতটুকুতে আপনি সন্তুষ্ট।

শুইবার সময় একুশ বার সূরা 'আন-নাছত্ম' পাঠ করিয়া রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জামালে মুবারক পবিত্র চেহারার ধ্যান করিবে এবং দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে। মাথা কালবের প্রতি এবং মুখ কিবলার দিকে করিয়া ডান কাতে শুইবে। اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (আসসালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ) পাঠ করিয়া ডান হাতের তালুতে ফুঁ দিবে এবং উহা মাথার নীচে রাখিয়া শুইয়া পড়িবে জুম'আর রাত্রে (বৃহস্পতিবার দিনগত রাত্রে) এবং সোমবার রাত্রে (রবিবার দিনগত রাত্রে) এই আমল করিবে। কয়েকদিন যদি কেহ এই আমল করিতে পারে তবে ইনশাআল্লাহ তাহার এই মকসুদ পূরণ হইবে।

কুন-ফায়াকুন নামায পদ্ধতি ঃ বিপদ-আপদ দূর করা এবং মুশকিল আসান করার বেলায় এই নামায পদ্দতি খুব শীঘ্র কাজ করে। কাহারো কোন প্রয়োজন দেখা দিলে বা কেহ যদি কোন বিপদে পড়ে তবে বুধবার রাত্রে (মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে) এবং বৃহস্পতিবার রাত্রে (বুধবার দিবাগত রাত্রে) সম্পূর্ণভাবে পাক পাকিজা হইয়া পর্ণ আন্তরিকতা ও ইখলাসের সহিত দুই রাকাত নামায পড়িবে। প্রথম রাকাতে 'আলহামদু লিল্লাহ' শরীফ একবার এবং 'কুল হুয়াল্লাহ' সূরা সোয়া শত বার পাঠ করিবে, আর দ্বিতীয় রাকাতে 'আলহামদু লিল্লাহ' একশত বার এবং 'কুল হুয়াল্লাহ' একবার পাঠ করিবে। পরে একশত বার বরিবে, হে সকল মুশকিল আসানকারী, হে অন্ধকারকে আলোকোজ্জ্বলকারী সত্তা। পরে একশতবার ইস্তিগফার এবং একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। অতঃপর একাগ্রচিত্তে হুযুরে কালবীর সহিত আল্লাহর দরবারে দু'আ করিবে।

তৃতীয় রাত্রে নামায এবং ঐ দু'আ-দরূদ পাঠ করার পর মাথা খালি করিয়া, ডান আস্তিন খুলিয়া উহা ঘাড়ে ফেলিয়া রাখিবে এবং কায়মনোবাক্যে কান্নাকাটি করিয়া পঞ্চাশ বার আল্লাহর দরবারে দু'আ করিবে। ইনশাআল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহার এই দু'আ কবূল করিবেন।

চিশতীয়া তরীকার বুযুর্গদিগের নিকট এই পদ্দতিটি অত্যন্ত ফলদায়ক এবং পরীক্ষিত। যেহতুে ইহার মাধ্যমে খুব শীঘ্র দু'আ কবূল হয়, সেইসেহতু এই নামায কে 'সালাত-ই-কুন ফায়াকুন' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

ইস্তেকারার নামায পদ্ধতি ঃ কোন কাজ শুরু করার পূর্বে ইস্তেকারা করিয়া লইবে। হাদীস ও সুন্নাত অনুযায়ী 'ইস্তেকারার' মধ্যে স্বপ্নে কিছু দেখার প্রয়োজন নাই। মনের অনুরাগ লক্ষ্য করাই যথেষ্ট। সময়ে না কুলাইলে নিম্নের দু'আট পড়িয়া নিলেই চলিবে।

ইস্তেখারা নিয়ম হইল, প্রথমে দুই রাকাত নামায ইস্তেখারার নিয়তে পাঠ করিবে। প্রথম রাকাতে 'আলহামদু' শরফ পাঠ করার পর 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' সূরা পা করিবে। আর দ্বিতীয় রাকাতে 'আলহামদু' শরীফ পড়ার পর 'কুল হুয়াল্লাহ' সূরা পাঠ করিবে। পরে সালাম ফিরা্য়া নিম্নের দু'আটি পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْفِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْفِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ -

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিইলমিকা ওয়াস আস্তাকদিরুকা বিক্বদাাতিকা ওয়া আস্আলুকা মিন ফাদ্বলিকাল আযম ফআন্নাকা তাক্বদিরু আল্লাহুম্মা ইন কুনতা হাৎলামু আন্না ক্বাযাল আমরা যায়রুল লী ফী দ্বীনি ওয়া মাআশী ওয়া আক্বিবাতি আমরী আওফী আজ্বিলি আমরী ওয়া আজ্বিলিহি ফাক্দিরহু লী ওয়া ইয়াস্ সিরহ লী ছুম্মা বারিকলী ফীহী ওয়া ইন কুনতা তা'লামু ইন্না হাযাল আমরা শাররুল-লী ফী দ্বীনী ওয়ামা'আশী ওয়া আক্বি বাতি আমরী আওফী আজ্বিলি আমরী ওয়া আজ্বিলিহি ফাছরিফ্হু আন্নী ওয়াসরিফনী আনহু ওাক্বদির লিইয়াল খায়রা হায়সু কানা সুম্মারদ্বিনী বিহি।)

অর্থ ঃ যে আল্লাহ, তোমার (অসীম) জ্ঞানানুসারে আমি তোমার নিকটই মঙ্গল প্রার্থনা করি। তোমার শক্তি হইতেই শক্তি চাই। তোমার মহান অনুগ্রহ হইতে আমি যাঞ্চা করি। নিশ্চয়ই আপনি সব বিষয়ে শক্তি রাখেন। আমরা কোন শক্তি নাই। আপনিই সর্ববিষয়ে অবহিত, আমার কোন জ্ঞান নাই। আপনিই গায়কব (অনাগত ও অদৃশ্য) সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। হে আল্লাহ। আপনি যদি জানেন যে এই বিষয়টি আমার জন্য ভাল হইবে দ্বীন, জীবিকা ও পণিাম হিসাবে অথবা আমার বর্তমান ও ভবিষ্যত হিসাবে তবে ইহা করার আমাকে শক্তি দিন এবং ইহা আমার জন্য সহজ করিয়া দিন এবং ইহাতে আমার জন্য বরকত নিহিত করুন। আর যদি আপনি জানেন যে, ইহা আমার

পক্ষে অকল্যাণকর-আমার দ্বীন, জীবিকা ও পরিণাম হিসাবে অথবা আমার বর্তমান ও ভবিষ্যত হিসাবে। ইহা আমার নিকট হইতে সরাইয় দিন এবং আমাকেও ইহা হইতে দূরে রাখুন। আমার জন্য যেখানেই মঙ্গল নিহিত তাহার শক্তি আমাকে দান করুন। অতঃপর আমার উপর আপনি ইহাতে সন্তুষ্ট থাকুন।

ইস্তেকারার দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ চিশ্‌তিয়া তরীকা রবুযুর্গগণ বলিয়াছেন, এশার পর ইস্তেখারার নিয়তে দুই রাকাত নাময পড়িবে। পত্যেক রাকাতে 'আলহামদু' শরীফ পড়ার পর তিন বার কুল হুয়াল্লাহ' সূরা পাঠ করিবে। সালাম ফিরাইবার পর শুরু এবং শেষে তিন বার করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিবে এবং মাঝে يَا سَلَامُ سَلِّمنِى (ইা সালামু সাল্লিম্‌নী) তিন শত ষাটবার পড়িবে। ইহার পর

يَا عَلِيْمُ عَلِّمْنِىْ يَا بَشِيْرُ بَشِّرْنِىْ يَاخَبِيْرُ خَبِّرْنِىْ يَا مُبِيْنُ بَيِّنْ لِىْ

(ইয়া আলীম আল্লিমনী, ইয়া বাশীরু বাশিরনী, ইয়া খাবারী খাবিরনী, ইয়া মুবীনু (বায়্যনলী) চরশত বার করিয়া এই দু'আ পাঠ করিবে। অতঃপর মুখ কেবলার দিকে, মাথা উত্তর দিকে এবং পা দক্ষিণ দিকে দিয়া মাটিতে মুইয়া থাকিবে। কোন ওযর থাকিলে অবশ্য অন্য কথা। তবে তখন আর কাহারো সহিত কথাবার্তা বলিতে পারিবে না; বরং দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে।

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রাত্রে এই আমল করিবে। এক রাত্রে যদি সে কোন কিছু বুঝিতে না পারে তবে তিন বা সাত রাত্র ইহা করিবে। ইনশাআল্লাহ তাহার মকসুদ পূরণ হইবে।

অন্য আরেকটি পদ্ধতি ঃ সূরা ফাতিহা একবার, সূরা নাস তিন বার, সূরা ফালাত তিন বার, সূরা ইখলাম তিনবার, সূরা কাফিরূন তিন বার, এবং 'ইযা যাআ নাছরুল্লাহ' পঁচিশ বার পাঠ করিবে। অতঃপর যতটুকু সম্ভব দরূদ শরীফ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া যাইবে। শুইবার সময় ডান হাত ফুঁ দিয়া উহা গলার নীচে রাখিয়া শুইবে।

সকাল ও বিকালের বিভিন্ন আমলের বর্ণনা

আধ্যাত্মিক সাধনায় যাহারা লিপ্ত ফরয ও সুন্নত কাজ আদায় করার পরও তাহাদেরকে এমন কিছু ইবাদত এবং ওজীফা আদায় করা কর্তব্য, কালবের মলিনতা দূর করিয়া উহাকে পবিত্র করার ব্যাপারে যেগুলি সহায়ক এবং মদদাগার বলিয়া গণ্য।

সুতরাং তাহাজ্জুদের দুই রাকাত বা বার রাকাত, ইশরাকের চার রাকাত, চাশ্‌ত চার রাকাত, সালাতুয্ যাওয়াল (সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর) ছয় রাকাত (কেহ কেহ বলেন বিশ রাকাত), আওয়াবীন, আছরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত, এশার পূর্বে চার রাকাত সুন্নত, সময়ে কুলাইলে জুমার দিন সালাতুত্, তাসবীহ তিন দিন, আইয়্যামে, বীজের রোযা, বৃহস্পতি ও সোমর এই দুই দিনের রোযা। শায়ালের ছয় রোযা, যিলহজ্জ মাসের শরুতে ছয় রোযা, এতটুকু সম্ভব না হইলে ইয়াউম আরাফার রোযা, আশুরার রোযা, রজব ও শাবান মাসের শুরুতে আট দিন রোযা তাহার আদায় করা উচিত। চল্লিশ দিনে একবার কুরআন খতম করিবে। ফজরের নামাযের সুন্নত ও ফরযের মাঝে বিসমিল্লাহ আরহামদুলিল্লাহ এক চল্লিশ বার পাঠ করিবে। ফজরের নামাযের পর সরা ইয়াসীন এবং দরবার কারিমায়ে চাহারাম পাঠ করবে। একশত বার পড়িবে। سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযীম)। একচল্লিশবার اَللّٰهَ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ (ওয়া বিহামদিহী আস্তাগফিরুল্লাহ) পাঠ করিবে سَيِّدِنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى এই দরূদ শরীফটি যত পরিমান সম্ভব পাঠ করিবে।

জুহরের নামাযের পর 'ইন্না ফাতাহনা' এবং সম্ভব হইলে দায়ায়লুল খায়রাত-এর এক মনযিল পড়িবে। আছরের নামাযের পর সূরা আম্মাইয়াতাসাআলুন' এবং একশত আয়াতে কারীমা পাঠ করিবে। বাদমাগরিব সূরা ওয়অকি'আ পড়িবে। বাদ এশা সূরা মূলক বা সূরা সোজদা এবং একশত বার يَا حَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ (ইয়া হায়্যু ইয়া ক্বায়্যুমু বিরাহমার্তিকা আস্তাগছু) একাগ্রচিত্তে শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফ পাঠসহ পড়িবে। সকাল বিকাল সায়্যিদুল ইস্তেগফার একবার, আল্লাহর নিরনব্বই নাম একবার এবং

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ
السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا
وَتَعَالَيْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

(আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালমা ওয়া মিনকাস সালামু ওয়া ইলাইকা ইয়ারজ্বিউস্ সালামু হায়্যানা রাব্বানা বিসসালমি ওয়াদ্‌খিলনা দারাসা সালমি তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তাআল্‌তা ইয়াযাল জ্বালালি ওয়াল ইকরাম।) আয়াতুল-কুরসী, اٰمَنَ الرَّسُوْلُ(আমানার রাসূল) হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত একবার পাঠ করিবে। اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا(আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি কুল্লিহা মিনশারমা কালাক্ব) তিনবার, সূরা হাশরের শেষ আয়তাসমূহ একবার এবং بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَافِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদ্বুররু মাআ ইসমিহি শায়্যুন ফীল আরদ্বী ওয়ালা ফীস সামায়ি ওয়া হুয়াস সামীয়ুল আলীম) তিনবার رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (রাদতু বিল্লাহি রাবা, ওয়াবিল ইসলামী দ্বীনান ওয়া কি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যান সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তিনবার এবং হিজবুল বাহার একবার পাঠ করিবে।

সম্ভব হইলে প্রত্রেক নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসী' একবার, 'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' তেত্রিশ এবং চৌথা কালিমা অর্থাৎ,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْىِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা মারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু য়ূহয়ী ওয়া য়্যুমীতু ওয়া হুলা হায়্যুন লা য়ামূতু বিয়াদিলিহ খাবরু ওয়া হুয়া আলা কূলি শায়িইন ক্বাদীর) এই দু'আ পাঠ করিবে।

আহারের পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আল্লাহুম্মা বারক লানা ফীহী) এবং আহারের

পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (আলহামদু লিল্লাহিল লাযি আতআমানা ওয়া সাক্বানা ওয়া জ্বাআলানা মিনাল মুসলিমীন) এই দু'আ পাঠ করিবে।

শুইতে যাওয়ার সময় একবার 'আলহামদু,' একবার আয়াতুল কুরসী, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্ নাস তিন বার এবং সূরা কাহাফের শেষ আয়াতসমূহ পাঠ করিবে। শোয়া হইতে উঠিয়া কালিমা-এ-চাহারম পড়িবে।

পায়খানায় যাইতে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (আল্লাহুয়া ইন্ন আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছি) এবং বারিরে হইয়া غُفْرَانَكَ (গুফরনাকা) পাঠ করিবে। উঠিতে বসিতে সকল সময় بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ (বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা রিদাকা) এই দু'আ পড়ার অভ্যাস করিবে।

ফজর ও আছরের নামাযের পর 'মুসাব্বিআতে আশারা' (যে দশটি জিনিস সাতবার করিয়া পড়িতে হয় সেইগুলিকে 'মুসাব্বিআতি আশারা বলা হয়। যেমন. সূরা ফাতিহা সূরা নাস। সূরা ফালাক, সূরা ইকলাস, সূরা কাফিরূন, ইয়াতুল কুরসী, কারিমা-এ-তামজীদ; দরূদ শরীফ وَالْاَمْوَاتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْنَا الْاَحْيَاءِ مِنَّا (আল্লাহুম্মাগ ফিরনা আল আইয়ায়িমিন্না ওয়াল আমওয়াত) এবং

اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ اِفْعَلْ لِىْ وَلَهُمْ عَاجِلاً وَّ اٰجِلاً فِىْ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهُ اَهْلُ وَلَاتَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهُ اَهْلُ اِنَّكَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

(আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বী, ইফআল লী ওয়া লাহুম 'আজ্বিলান ওা আজ্বিলান ফীদ দীন ওয়াদদুনিয়া ওয়ালআখিরাতি মা আনতা লাহু আহ্‌ল ওয়ালা তাফআল বিনা ইয়ামাওলানা মা নাহনু লাহু আহল ইন্নাকা গাফুরুন হালমিনু, জ্বাওয়াদুন, কারীমুন, মালিকুন, বার্‌রুর রাউফুর রাহমী) পাঠ করিবে।

ইহা ছাড়াও আরো বহু দু'আ ও ওজীফা রহিয়াচে। কাহারো মন চাহিলে 'হিসনে-হাসীন' ইত্যাদি পুস্তকসমূহে ঐগুলি দেখিয়া নিতে পারে তবে সবাবস্থায়ই রূহানী যিকর শুগরে তাহার মশগুল থাকা কর্তব্য।

খতমে খাজেগান পড়ার নিয়ম ঃ ওলীগণের কেহ কেহ মনের ইতমিনান এবং প্রশান্তির উদ্দেশ্যে খতমে কাজেগান পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা পাঠ করার তরীকা হলি, প্রথমে সাতবার 'আলহামদু' শরীফ পাঠ করিয়া ঊনা বার সূরা আলাম নাশরাহ লাকা এবং একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। অতঃপর এক হাজার বার সূরা ইখলাস, সাতবার 'আলহামদু', একশত বার দরূদ শরীফ এবং একশত বার এই দু'আটি পাঠ করিবে।

يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ - يَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ - يَا دَافِعَ الْبَلِيَاتِ - يَا حَلَّ الْمُشْكِلَاتِ - يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ - يَا شَافِيَ الْأَمْرَاضِ يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنِ -

(ইয়া কাদ্বিয়াল হাজ্বাত, ইযা কাফিয়াল মুহিম্মাত, ইয়া দাফিআল বারিয়্যাত, ইয়া হাল্লাল্ল মুশকিলাত, ইয়া রাতিয়াদ দারাজাত, ইয়া জাফিয়াল আমরাদব, ইয়া মুজ্বাদ দাওয়াত, ইয়া আরহামার রাহিমীন।

চিশ্‌তিয়া খতমে খাজেগান পদ্ধতি ঃ বিপদ-আপদ বা মুশকিল বিষয়ের সম্মুখনি হইলে ওজু করিয়া কিবলামুখী হইয়া বসিবে। প্রথমে দশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া তিনশত ষাট বার لَامَلْجَا وَلَامَنْجَا الاَّ اِلَيْهِ (লা মালজা ওয়ালা মানজা ইল্লা ইলাইহি) এই দু'আ পড়িবে এবং তিনশত ষাট বার 'আলাম নাশরাহ লাকা' সূরা পাঠ করিবে। অতঃপর পুনরায় উক্ত দু'আটি তিনশত ষাট বার পড়িয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিবে এবং আল্লাহর নিকট মকসুদ পূরণের দু'আ করিবে।

কাদরিয়া তরীকা খতমে খাজেগান পদ্ধতি ঃ বড় কোন মদসুদ পূরণের জণ্য প্রথমে দুই রাকাত নফল নামায আদয় করিবে। অতঃপর একশত এগার বার সূরা আলামনসরাহ লাকা, একশত এগার বার কালিমা-এ-তামজীদ, একবার সূরা ইয়সীন পাঠ করিবে। আরো বড় খতম পড়িতে চাইলে 'আলাম নাশরাহ লাকা' এক হাজা রবার পাঠ করিবে। আর ছোট খতমের বেলা য়উহা একশত একচল্লিশ বার পাঠ করিবে। তবে বড় হউক বা ছোট সকল অবস্থায়ই

একশত এগারবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। আল্লাহ'র নিকট মকসুদ পূরণের জন্য দু'আ করিবে।

সুলুকের বাধাসমূহ এবং এইগুলি দূরীকরণের উপায়

কল্পনা, অনর্থক ধ্যান, চিন্তা, সন্দেহ ইত্যাদি বিষয় সুলুকে পথে (আধ্যাত্মিক সাধানর পথে) বিরাট বাধা হইয়া দাঁড়ায়। এইগুলি এক একটি বিরাট রোগ। বুযুর্গগণ ইহার চিকিৎসাও আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

খারাপ ও মন্দ কল্পনা ও চিন্তার ফলে আধ্যাত্মিক সম্পর্কে এবং কালবী নিসবতের ক্ষেত্রে যদি কোন রূপ বিঘ্নের সৃষ্টি হয় তবে ভাল করিয়া গোসল করিবে, নূতন কাপড় পরিধান করিবে, সুগন্ধি লাগাইবে এবং নির্জনে (যেখানে কোন রূপ শোরগোলের শব্দন না পৌঁছে) গিয়া বসিবে। তিন বার মুআওয়াযাতাইন (সূরা ফালাক এবং নাস) ও কুল হুয়াল্লাহ পাঠ করিয়া তিন বার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ (আউযু বিল্লাহি মিন জামিই-এর শেষ পর্যন্ত), তিন বার আউযু বিল্লাহ পড়িবে এবং বাম কাঁধের দিকে ফুঁ দিবে। অতঃপর দাঁড়াইয়া দুই রাকাত নফল নামায পড়িবে। পরে যত পরিমাণ সম্ভব এই দু'আটি পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ عَنْ غَيْرِكَ وَنَوِّرْ قَلْبِىْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ (আল্লাহুম্মা তাহ্হির ক্বালবী আন গায়রিকা ওয়া নুওর ক্বালবী বিনূরি মারিফাতিকা আবাদান ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ) পরে বাম দিকে 'ইয়া নূরু' ডান দিকে ইয়া নুরু, এবং দিলেও 'ইয়া নূরু'- এর পুনঃ পুন জাবর লাগাইবে।

ইহার পরেও যদি মনে অস্থিরতা থাকিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ ওযু করিয়া পুনরায় এই যিকিরেই মশগুল হইবে। আবারো অস্থিরতার সৃষ্টি হইলে তাহাই করিবে। ইনশাআল্লাহ দুই তিনবারের মধ্যে মন প্রশান্ত ও সুস্থির হইয়া উঠিবে। ইহার পর لَا فَاعِلَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ব্যতীত কাহারও কিছু করার নাই) এবং لَامَوْجُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ব্যতীত কাহারো অস্তিত্ব নাই) এই কথার ধ্যান সহ আরোহ অবরোহ, তেজ ও লয় এবং সুন্দর সুমিষ্ট সরে নফী ও ইসবাতের যিকির করিতে লাগিয়া যাইবে।

অন্য আরেকটি পদ্ধতি ঃ يَا اَللّٰهُ (ইয়া আল্লাহ), يَا فَعَّالُ (য়া ফা আলু), يَا فَتَّاحُ (ইয়া ফাত্তাহু),يَا بَاسِطُ(ইয়া বাসিতু) এই ইসমগুলির

কোন একটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট তরীকায় তিন জাবরী বা চাহার জাবর যিকির শুরু করিবে। ইহার পরও যদি মন্দ ধারণাসমূহ দূর না হয় এবং মিজাজ অস্থির হইয়া পড়ে তবে উল্লেখিত ধ্যান করিয়া কয়েকবার নফী ও ইসতবাতের যিকির করিবে। খেয়াল করিবে, এই যে ধারণাসমূহ মন্দ হউক বা ভাল হউক আল্লাহর মাধ্যমেই কায়েশ রহিয়াছে, এমন কি খোদ আল্লাহর সহিতই এইগুলি সংশ্লিষ্ট (কাহারো কাহারো ধারণা, মন্দের প্রকাশও আল্লাহর তরফ হইতেই হইয়া থাকে।) অতঃপর এই দুৎআটি পাঠ করিবে।

هُوَ الْاَوَّلُ هُوَ الْاٰخِرُ هُوَ الظَّاهِرُ هُوَ الْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ

(হুয়াল আওযালু হুয়ায আকিরু হুয়ায যাহিরু, হুয়াল বাতিলু, ওয়া হুয়া বি কুল্লি শায়্যিন আলীম) ইহাতে নিঃসন্দেহ আল্লাহর প্রতি তাহার আগ্রহ ও অধীনতা বৃদ্ধি পাইবে এবং সকল প্রকার মন্দ ধারণা তাহার মন হইতে বিদূরিত হইয়া যাইবে।

তাফরিকা বা মানসিক অস্থিরতার ধরন এবং ইহার চিকিৎসা ঃ

মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টির বিভিন্ন কারণ রহিয়াছে। কখনো কখনো আগ্রহ অতিশয়তা জনিত ফসাদের দরুনও ইহা হইয়া থাকে। অথচ আল ।লাহর অসীম অসতিত্বে স্বীয় অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করা ভিন্ন ইহা লাভ হইতে পারে না। আর ঐ বিলীনতা নির্ভর করে হৃদয় ও মেজাজের প্রমান্তি র উপর কিংবা অনেক সময় আগ্রহের তীব্রতার দরুন মারাত্মক কষ্টসাধ্য রিয়াজত সাধানার ভার নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া নেয়। হঠাৎ করিয়া নফসকে সকল ধরনের উপভো ও আকাঙ্খা হইতে বিরত, ক্ষুধা, পিপাসা এবং বিশ্রাম পরিত্যাগ করার অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করিয়া নেয়, ফলে মেজাজা বিনষ্ট হইয়া পড়ার দরুণ স্ফূর্তি ও আনন্দ, পেরেশানী এবং বিষন্নতায় পরিবর্তিত হইয়া যায়। ইহার চিকিৎসা হইল, হালাল জিনিস ভোগের ক্ষেত্রে নফসকে সুযোগ প্রদান করা এবং পূর্ণ স্ফূর্তি, এবং আনন্দ ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত রিয়াযত মুজাহাদা স্থগিত রাখা।

কখনো কখনো দুর্বলতা এবং সাহসের অভাজনিত কারণেও ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রবৃত্তিসমূহ পরিত্যাগ করার মত সাহস সে পায় না। ফলে সে সানসিক অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের শিকার হইয়া পড়ে। ইহার চিকিৎসা হইল নিজেকে বুঝান এবং নছীহত করা। মুসলমান এবং সত্যান্বেষী ব্যক্তি স্বীয়

হিম্মতকে রিয়াযত মুজাহাদা এবং আল্লাহ্ আনুগত্যে ব্যয় করে। পক্ষান্তরে মুনাফিক এবং আল্লাহ'র দুশমন বসন ব্যাসন, আমোদ আহ্লাদ এবং প্রবৃত্তির পিছনেই নিজেদের হিম্মত ও কর্মশক্তিকে খরচ করে। সত্যান্বেষী ও স্বীয় জানপ্রাণ সব কিছু আল্লাহর দ্বীনের কাতিরে কুরবান করিয়া দেয়, পক্ষান্তর মুনাফিকরা নিজের দ্বীন ও ঈমানকে টাকা পয়সার জন্য কুরবান করিয়া দিতে দ্বিধা করে না। আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন।

শয়তান কর্তৃক সৃষ্ট কুচিন্তার কারণেও এই মানসিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে মন নিরাশা ও দুর্বলতার শিকার হইয়া পড়ে বা পীর ও মুর্শিদের কথার উপর প্রশ্ন তুলিতে শুরু করিয়া দেয়। ইহার চিকিৎসা হইল, সাহস ফিরাইয়া আনা এবং لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ (আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না)- এই কথা কেয়াল করা। সঙ্গে সঙ্গে হযরত খিজিরের সহিত মূসা আলায়হিস সালামের যে ঘটনাটি হইয়াছিল তাহারও স্মরণ করা।[১]

বিভিন্ন নাফসানী রোগও ইহার কারন হইয়া থাকে। এই সমস্ত রোগের তমসা সত্যান্বেষীর মনে ছায়া ফেরে, ফলে তাহার মধ্যে নিরাশা, বিষন্নতা এবং অস্থিরতা দকা দেয়। ইহার চিকিৎসা হইল, বিনয় বা নফসের জন্য যাহা কষ্টকর সেইভাবে ইহাকে যলীল করা বা সব সময় যিকির করা এবং নির্জনতা অবলম্বন করা।

বিষণ্নতা এবং নিয়তের পেরেশানীও এই মানসিক তাফরিকা ও অস্থিরতার কারণ হইতে পারে। কালবের যতটুকু পরিমাণ পরিচ্ছন্নতা এবং ঔজ্জ্বল্য সে অর্জন করিতে চায় এবং যতটুকু পরিশাণ সে ইহার জন্য চেষ্টা করে সেই পরিমাণ তাহার মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি হইয়া পড়ে। ইহার কারণ হইল, শারীরিক মেজাজ বিনষ্ট হইয়া যাওযা এবং দিলের উপর শুষ্কতার প্রভাব। ইহার চিকিৎসা হইল সিঙ্গা লাগাইয়া বা বমি করিয়া পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা এবং স্বাস্থ্যের ভারসাম্য রক্ষা করা।

বেওযু বা অপবিত্র থাকাও ইহার কারণ হইতে পারে সুতরাং নিজেকে পরিষ্কার পরিসচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা উচিত।

---

১. কুরআনে করীমের ১৫ পারার শেষে এবং ১৬ পারার শুরুতে এই ঘটনাটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

দরিদ্রদের উপর জুলুম এবং প্রকৃত স্বত্বাধিকারীর অধিকার হরণ করাও ইহার কারণ হইতে পারে।ইহার চিকিৎসা হইল জুলুম হইতে না দেওয়া এবং কাহারো হক হরণ না করা।

হারা বা সন্দেহযুক্ত আহার গ্রহণ করাও এই তাফরিকাহ বা মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ হইতে পারে। ইহার চিকিৎসা হইল মুওয়াওয়াযাতাইন (সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পাঠ করা) এবং যুতটুকু সম্ভব ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ' যিকির করা।

কখনও কখনও ওলিগণের সহিত বেআদবী করার দরুনও এই পেরেশানীর সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইহার চিকিৎসা হইল ওলিগণের সহিত বেআদবী না করা।

এই ধরনের মানসিক চাঞ্চল্য ও সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতা দূরকরণের জন্য শরীর ও কাপড়ের পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত নফী ও ইসবাতের যিকির করাও উচিত।

চিল্লার নিয়ম ও পদ্ধতি ঃ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তরীকত পন্থীগণ চিল্লা (বিশেষ পদ্দতিতে একাধারে চল্লিশ দিন সময়) দেওয়ার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রচলন করিয়াছেন। ইহার সনদ এবং উপকারিতার বিবরণ সুলুক তাসাউফের কিতাবসমূহে বিস্তারিত লেখা হইয়াছে। নাতিদীর্ঘ এই পুস্তি কাটিতে সকল কিছুর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে।

ইহার পদ্ধতি হইল, প্রথমে নিয়্যথ খালেস করিবে। অর্থাৎ সুন্নতের অনুসরণের মাদ্যমে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানই তাহার উদ্দেশ্য হইতে হইবে। ইবাদতের উদ্দেশ্যে নিজেকে আল্লাহ ভিন্ন আর সকল কিছু হইতে আলাদা করিয়অ যিকির ইত্যঅদিতে মশগুল হইবে। খেলওয়াতে (একাকী থাকা) এর জন্য জামে মসজিদেই সর্বোত্তম স্থান। ইহাতে জুমা এবং জামাতের নামায ফওত হওয়ার আশংখা থাকিবে না।

যাহা হুক, চিল্লার নিয়্যত করার পর গোসল করিয়অ পাকসাফ হইয়া নূতন কাপড় পরিধান করিবে এবং সুগন্ধি লাগাইবে। অতঃপর শাবান মাসের বিশ তারিখ আছরের পূর্বে (যে সময় নফল পড়া জায়েয) 'আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ মুাওয়াযাতাইন (সূরা ফালাক, সূরা নাস) এবং কারিমা তামজীদ পড়িয়া শায়খ ও মুশিদের ওসীলায় তরীকতের বুযুর্গগণের পবিত্র রূহসমূহের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া করার সময় এই দুআ পাঠ করিবে-

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু আলা রাসূলিল্লাহ) প্রথমে ডান পা রাখিবে এবং এই দুআ পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

(আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা)

আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল কিছু হইতে মুক্ত হওয়ার এবং আল্লাহর সহিতই কেবল বিজড়িত খাকার নিয়্যতে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করিবে। আছরের পর যদি খেলওয়াতের কামরায় প্রবেশ করে তবে আর সেই সময় নফল পড়িবে না। (কারণ, এই সময় লফল পড়িতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন।) অতঃপর কিবলার দিকে মুখ করিয়া বসিবে এবং ইহজগতে ও পরজগতে সকল কালের পথ প্রদর্শক রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রূহের উপর ফাতিহা পাঠ করিবে এই কাজে এবং দ্বীনের উপর সুর্দঢ়তা অর্জনের জন্য তাঁহার রূহে পাক হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিবে।

ইহার পর পীর মুর্শিদের শিক্ষানুযায়ী যিকির, মুগল, মুরাকাবা ইত্যাদিতে মশগুল হইয়া থাকিবে।

খেলওয়াত (একাকীত্ব)-এর শর্ত হইল, সর্বদা রোযা রাখা, কম ঘুমান, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা কম করা, সব সময়ে পবিত্র থাকা, ইবাদত আদায়ের ব্যাপারে নিত্য-সচেষ্ট থাকা, দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং সদা সর্বদা যিকির করা। খেলওয়াতের এই শ,র্তাবলী এবং রকম সমূহের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে। এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও উদাসীনতা প্রদর্শন করিবে না। এই ভাবে যদি খেলাওয়াত পালন করিতে পারে তবে ইহার যথার্থ উপকারিতা অর্থাৎ ভাল পরিণাম দেখিতে পাইবে। রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রসমূহ অর্থাৎ একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ এবং ঊনত্রিশের রাত্র সম্পূর্ণ জাগরণ করিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে শবেক্বদরেরও বরকত হাসিল করিতে পারিবে।

অন্যান্য রাতের অন্তত ঃ তিন ভাগের এক ভাগ রাত জাগিয়া কাটান উচিত। শুইতে যাওয়ার সময় যিকির করিতে করিতে শুইবে। রাত্রের শেষ তৃতীয় ভাগে উঠিয়া শীঘ্র ওযু ইস্তেনজা করিয়া তাহাজ্জুদ আদায় করিবে এবং ভোর পর্যন্ত যিকির, শুগল এবং মুরাকাবয় মশগুল হইয়া থাকিবে। ঈদের চাঁদ দেখা যাওয়ার পর বাদ মাগরিব দুই রাকাত নফল পড়িয়া খেলওয়াত হইতে বাড়ির হইবে।

খেলওয়াতের শর্তসমূহ ঃ মুজতাহিদে তরীকত হযরত যুনায়াদ বাদগাদী (রহঃ) খেলওয়াতের নিম্নবর্ণিত কতিপয় শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

প্রথম ঃ সব সময় ওজুর সহিত থাকিবে। যে সময়ই ওজু নষ্ট হইবে শীঘ্র ওযু করিয়া লইবে। ইহাতে মেজাজে স্ফূর্তি আসে এবং কালবের মধ্যে নূরানিয়্যাত বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় ঃ সর্বদা রোযা রাখা। মাগরিবের নামাযের পূর্বেই ইফতার করিবে এবং এশা পর আহার করিবে। ইহাতে যদি বেশী কষ্ট হয় হবে মাগরিব ও এশার মাঝেও আহার কিরয়া লইতে পারিবে।

তৃতীয় ঃ কম খাওয়া। পেটের এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখিবে। সম্ভব হইলে আহার আরো কম করিবে। তবে এত কম করিবে না যে শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে এবং মনে স্পূর্তিভাব ও ইবাদতের স্বাদ বিনষ্ট হইয়া যায়। মোটকথা, কম খাওয়া দ্বারা মন নরম থকে এবং দিলের পরিচ্ছন্নতা ও ফেরেশতা সুলভ শক্তি বৃদ্ধি পায়। বলা হইয়া থাকে, ক্ষুধা হইল আল্লাহর আহার।

চতুর্থ ঃ আল্লাহর যিকির ভিন্ন মুখ হইতে আর কিছুই বাহির করিবে না। খেলওয়াতের সময় কাহারে াসহিত কোন রূপ কথা বলা উচিত নহে। তবে ধর্মীয় ব্যাপার হইলে প্রয়োজনানুসারে খাদেমের সহিত কথা বলিতে পারে। খাদেম ভিন্ন অন্য কাহাকেও খেলওয়অতের স্থান আসিতে দেওয়া উচিত হইবে না। কেননা, চুপ থাকার ম্যাধমেই হিকমত ও জ্ঞানের অনন্ত রহস্যরাজির উন্মোচন হয়। পক্ষান্তরে অহেতুক কথাবার্তার কারণে যিকিরে নূর বিনষ্ট হইয়া যায়।

পঞ্চম ঃ সর্বদা যিকির এবং মুরাকাবা 'আনা জলীছুম্ মান যাকারানী (যে আমার যিকির করে আমি আল্লাহ্ তাহার সঙ্গী)-এই বাক্যটির মর্ম এমনভাব ধ্যান করিবে যে ইহাতে যেন এতটুকু উদাসীনতার সৃষ্টি না হয়। ধ্যান অর্জন করাই খেলওয়াতের মূল উদ্দেশ্য।

ষষ্ঠ ঃ মনের অনাহূত ধারণাসমূহের বিদূরণ। গায়রুল্লাহর ধ্যান ভাল হউক বা মন্দ-সকল অবস্থায়ই উহা বিদূরণে সচেষ্ট থাকা উচিত। কেননা, এই সকল কল্পনা ও অনাহূত ধারণা যিকিরে বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং উহাদে কলবে আঁধার নামিয়া আসে। তদুপরি খেলওয়াতের উপকারিতা বিনষ্ট করিয়া দেয়।

সপ্তম ঃ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় শায়খ মুর্শিদের সহিত সর্বদা সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিবে। ধারণা রাখিবে, এই শায়খও আল্লাহর প্রকাশ স্থল।

আমাকে ফয়জ পৌঁছাইবার জন্য আল্লাহ পাক ইহাকেই আমার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই শায়খের মাধ্যমেই আমার আল্লাহর পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব। মোটকথা, বারবাসা ও আনুগত্যসহ সর্বদা পীর ও মুর্শিদের প্রতি মুতাওয়াজ্জুহ থাকিবে। ইহাতে তাঁহার উপর একদিন ফয়েজ ও বরকতের দ্বার উন্মোচিত হইয়া উঠিবে। পীর ও মুর্শিদ সম্পর্কে কোন প্রকার প্রশ্ন বা অভিযোগ মনে ঠাঁই দিবে না। কেননা, ইহাতে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ বাধাগ্রস্ত হয়।

কতিপয় বিশেষ উপদেশ

পরকালে মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকাইদ ও ধর্ম-বিশ্বাস অনুসারে স্বীয় আকীদা বিশুদ্ধ করিতে থাকিবে প্রত্যেক সালিক অর্থাৎ খোদাপথযাত্রীর কিছু মসলা-মাসায়িল শিক্ষা করা কর্তব্য। সকল বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবীগণের অবলম্বিত পন্থার অনুসরণ করিয়া চলা উচিত। ইহার পর নফসের পবিত্রতা এবং উহা ভিন্ন অন্য সকল কিছু হইতে মুক্ত করার উপায় অবলম্বনের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা কর্তব্য। কোন এক বুযুর্গ কবি বলেন ঃ

হৃদয়কে যদি কাঁচের মত স্বচ্ছ করিতে চাও
এই দশটি মন্দ স্বভাব থেকে নিজকে মুক্ত রাখ
লোভ, দীর্গ আশা, ক্রোধ, মিথ্যা, গীবত,
কৃপণতা, দ্বেষ, রিয়াকারী, অহংকার ড়াং হিংসা।

অতঃপর কালবের নিষ্কলুষতা ও ইহার ঔজ্জ্বল্য বিধানের (সদগুণাবলী দ্বারা ইহাকে বিভূষিত করার) প্রতি দৃষ্টি দিবে। নিম্নোল্লিখিত চতুষ্পদি কবিতাটিতে উহার দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কবি বলেন ঃ

আল্লাহর নৈকট্য যদি অর্জন করিতে চাও
এই নয়টি সদগুণাবলী দ্বারা নিজেকে বিভূষিত কর
ধৈর্য, মুকর, অল্পে তুষ্টি, জ্ঞান, দৃঢ় বিশ্বাস
তফজীব (আল্লাহর উত্তর সোপর্দ করা) তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর নির্ভর করা)
রেয় (আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা)
তসলীম (দ্বিধাহীন চিত্তে আল্লাহর ফয়সালা মানিয়া লওয়া)

ফা ঃ শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহ পালন করিয়া চলা এবং উহার নিষেধসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকা প্রত্যেক সালিক বা খোদা পথ যাত্রীর সর্বপ্রধান কর্তব্য। পরহেজগারী এবং আল্লাহর ভয়কে পাথেয় বলিয়া মনে করিবে।

সর্বাবস্থায় রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আল্লাহর নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি এবং সন্দেহযুক্ত জিনিসসমূহ হইতে সর্বদা বাঁচিয়া থাকিবে গুনাহ হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তওবা ইস্তেগফার করিবে। কোন নেক আমল করিয়া উহার ক্ষতিপূরণ করিবে। সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষায় বাসিয়া থাকিবে না। জামাতে নামায পড়িবে। ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নত আদায় করার যতটুকু সময় পাইবে তাহা বাতেনী ও আধ্যাত্মিক জিকির শুগল আদায় করার পিছনে লাগাইব। নফল এবং ওজীফা ইতাদির সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে মূল লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিবে না। বাতেনী শুগল যথাযথবাবে আদায় করা নিজের উপর অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে। ইহা হইতে কখনো উদাসীন হইবে না। ইহাতে স্বাদ অনুভূত হইলে শুকর আদায় করিবে। সামান্যতম স্বাদকেও অনেক বেশী বলিয়া ভাবিবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত সকল কাজ করিবে। কাশফ এবং অলৌকিক ঘটনা সংঘটনের প্রতি লক্ষ দিবে না এবং এই দরনে বিষয়াদি হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখিবে।

বস্ত[১]– এর অভস্থায় আল্লাহর শুকর আদায় করিবে এবং শরীয়তের নির্ধারিত সীমা রেখার খেয়াল রাখিবে কবজ[২]–এর অবস্থায়ও নিরাশ বা অস্থির হইঅ পড়িবে না। বরং যথাবিহিতি নিজের কাজ আঞ্জাম দিয়া যাইবে। স্বীয় ভুল স্বীকার করিবে। ইবাদত আদায় করার ব্যাপারে নিজেকে সর্বদা ত্রুটিপূর্ণ মনে করিবে। শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ কোন ব্যকিতর সম্মুখে নিজের বাতেনী অবস্থার কথা বর্ণনা করিবে না। গায়র মুহাররাম (যাদের সহিত পর্দা করা জরুরী এবং বিবাহ হারাম নহে) কাহারো সামনেও নিজের অবস্থা প্রকাশ করিবে না। মুহাররাম (যাহাদের সহতি বিবাহ হারাম)- দের নিকট বলার সময়ও অন্য কাহারো সামনে প্রকাশ করিবে না। বরং বলিতে হইলে নির্জনে আলাদা করিয়া বলিবে। সময়ের পারন্দী করিবে এবং চঞ্চলতা ও দৃঢ়হীনতা হইতে দূরে থাকিবে। অন্তর হইতে দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবথীয় সব কিছু মুহব্বত ও ভালবাসা পরহার করিবে। আর তাহা যদি না হয় তবে হাজার বৎসর ইবাদত করিলে ও কোন উপকার হইবে না।

হৃদয় একটি স্বচ্ছ আয়নার মত। ইহাতে কখনও আল্লাহ বিন্ন অন্য কাহাকেও অবলোকন করিবে না। সম্মান এবং মর্যাদা লাভের আকাঙ্খা করা নিজেকে পথভ্রষ্ট করার শামিল। ইহা হইতে সর্বদা পানহা চাহিবে। সময়কে অতি ----------

১. অর্থাৎ ইবাদত করিতে যখন মনে স্ফূতি লাগে।

২. ইবাদত করিতে মনে যখন স্ফূতি না লাগে।

মূল্যবান এবং সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া মনে করিবে। উদাসীনভাবে অনর্থক কাজে উহাকে নষ্ট হইতে দিবে না। যে সময় চলিয়া যায় উহা আর ফিরিয়া আসে না। বীরের মত সৎকাজে আগাইয়া যাইবে। আনন্দ ও বিষন্নতা সবকিছুর ঊর্ধ্বে অবস্থান করিবে। কেননা এইগুলি এক প্রকার পর্দা।

যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের পাবন্দ নহে বা সমতাবলম্বী নহে সে ধরনের ব্যক্তির সংসর্গে যাইবে না, যদিও তাহার থেকে ও অলৌকিক কিছু সংঘটিত হইতে পরিলক্ষিত হয়, সে আকাশে উড়িতে সক্ষম হয়।

মানুষের প্রয়োজনের বেশী মেলামেশা করিবে না। ভালমন্দ সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। মানুষের সহিত বিনয় ও নম্র আচরণ করিবে। বিনয় এবং শুভাকাঙ্খার পথ ধরিয়া থাকিবে। কাহারো বিরুদ্ধ প্রশ্ন তুলিবে না। নম্র ও কোমলবাবে কথাবার্তা চলিবে। নির্জনতা ভালবাসিবে এবং স্থির প্রশান্তি লইয়া নিজের কাজে মশগুল হইয়া থাকিবে। কখনো অস্থির হইবে না। কোন বিষয়ের সম্মুখন হইলে ইহাকে আল্লাহর তরফ হইতেই আসিয়াছে বলিয়া ভাবিবে। সব সময় মনের হেফাজত ও নেগাহ্বানী করিবে। আল্লহা ভিন্ন অন্য কাহারো খেয়ালও যেন ইহাতে না আসিতে পারে। ধর্মীয় বিষয়ে অন্য মানুষের উপকার করিতে সচেষ্ট থাকিবে। খালস অর্থাৎ শুধূমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের নিয়্যতে সকল কাজ করিয়া যাইবে। পানাহারে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে এত বেশী আহার করিবে না যে, অলসতার শিকার হইয়া যাইবে, আর এত কম আহার করিবে না যে, দুর্বলতার ফলে ইবাদত করার শক্তি লোপ পাইয়া বসিবে। প্রতিটি কাজে চরমপ্রান্তিকতা পরিহার করিয় চলিবে। (নাফসের আকাঙ্খা যদি পূরণ কর তবে উহা দ্বারা কাজ লইবে।) উপার্জন করিয়া ভোগ করা উত্তম। কেহ যদি পূর্ণ তাওয়াক্কুল করিয়অ চলিতে পারে তবে তাহাও ভাল। তবে কাহারো প্রতি কোনরূপ আশা করিবে না। মনকে সর্বদা আল্লাহ্ ভিন্ন যাবতীয় সকল কিছু হইতে মুক্ত ও পবিত্র রাখিবে। কাহারো আশা বা ভয় রাখবে না। আল্লাহ্ ভিন্ন কাহারো প্রতি ভালবাসা পোষণ করিবে না। সত্য ও হকের তালাসে অস্তির হইয়া থাকিবে।

সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর সহিত অবস্থান করিবে। কম বা বেশী সকল প্রকার নেয়ামতের শুকর আদায় করিবে। দারিদ্র্য, অভাব এবং ক্ষুধার দরুন অস্থির পেরেশান হইা উঠিবে না। বরং উহাতেই নিজের সম্মান, মর্যাদা ও

গৌরব নিহিত রহিয়াছে বলিয়া ধারণা কিরবে। আল্লাহর শুকর করিবে যে, তিনি তোমাকে ওলী ও নবীগণের মর্যাদায় রাখিয়াছেন।

সঙ্গী ও সংশ্লিষ্ট রোকদের সহিত দয়ার এবং নরম আচরণ করিবে। ইহাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিবে এবং ওযর আপত্তি কবূল করিবে। গীবত করা হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে। মানুষের দোষ গোপন করিয়া যাইবে। নিজের দোসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে। সকল মুসলমানকেই আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিবে। নিজেদের দিকটা হক হইলেও কাহারো সহিত ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হইবে না।

মুসাফিরগণের তত্ত্ববধান এবং মেহমানদারীর অভ্যাস করিবে। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের সংসর্গে থাকা পছন্দ করিবে। আলিম ও নেক লোকগণের খেদমত ও সেবা করাতে নিজের সম্মান ও গৌরব নিহিত করিয়া মনে করিবে।

নিজের যাতা কিছুই আছে তাহা ভালকাজ ব্যয় করিবে। ইহাতে উহা দ্বারা কোন ক্ষতি হইবে না। কোন কিছুর সহিতই আন্তরিক সম্পর্ক রাখিবে না। কিছু থাকা বা না থাকা এক সমান বলিয়া ধারণা রাখিবে্ দরিদ্র লোকদের পোশাক পরিচ্ছদ পছন্দ করিবে। খাদ্য বা পরিচ্ছদে যতটুকুই সামর্থ্যে কুলায় ততটুকুতে তুষ্ট থাকিবে। নিজে নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দানের অভ্যাস করিবে। ক্ষুত-পিপাসার্ত থাকিতে (যাতা আল্লাহর গুণ ভালবাসিবে। কম হাসিবে, বেশী কাঁদিবে। আল্লার হর আযাব, অনপেক্ষতার ভয় রাখিবে। মৃত্যু, যাহা আল্লাহ্ ভিন্ন সকল কিছুকেই ফানা ও লীন করিয়া দেয় উহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। বাঁচিয়া থাকা রস্থান জাহান্নাম হইতে সর্বদা পানাহ মাগিবে, আর মিলনের স্থান জান্নাতের সর্বদা কামনা করিবে। মাগরিব বাদ দিনের কাজের, আর বাদ ফজর রাত্রে হিসাব লইবে। ভাল কাজ হইত দেখিলে আল্লাহর শুকর আদায় করিবে আর মন্দ কিছু হইলে আন্তরিক তওবা ইস্তিগফার করিবে। সত্য বল ।এবং হালাল আহার গ্রহণ করা অত্যঅবশ্যক করিয়া লইবে। অনর্থক এবং বেহুদা বৈঠকে যাইয়া শামিল হইবে না। জাহেলী রসম ও প্রথা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে্ বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, আনন্দ ও ক্রোধ সকল কিছুই আল্লাহর খাতিরে করিবে।

কৃপণ এবং লোভী হইবে না। লজ্জাশীল হইবে। কম কথা বলিবে। দুঃখ ও বিষন্নতাশূন্য এবং সমঝোতা পছন্দ করিবে। আল্লাহর অনুগত সৎ-কর্মশীল এবং রাশভারী হইবে। ইহাই সদ্ব্যবহার ও সদাচরণে প্রমাণবহ বলিয়া গণ্য।

অহংকার করিবে না। নিজেকে ভাল মনে করিবে না। মাশায়েখ ও ওলীগণের কবর যিয়ারত করিবে। অবসর সময় ইহাদের কবরের পার্শ্বে আসিয়া রূহানিয়্যাতসহ মুহতাওয়াজ্জুহ হইবে এবং স্বীয় পীর মুর্শিদের সুরতে ইহাদের ধ্যান করিবে ও ফয়জ হাসল করিতে সচেষ্ট হইবে। কখনো কখনো সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থানে যাইয়াও মৃত্যুর কথা স্মরন করিবে। কেননা, তাঁহারা আল্লাহ ও রাসূলে পাকের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া গণ্য।

যে ব্যক্তি আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করে, সে যেন মওলবী রশীদ আহমদ এবং মওলবী কাসিম (নাতুতবী) সাহেবদ্বয়কে (আল্লাহ তাঁহাদেরকে সকল বিপদ-আপদ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে রক্ষা করুন। ইহারা উভয়েই জাহেরী ও বাতেন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল গুণ ও কামালাতের অধিকারী) আমার স্থলে অধিকন্তু আমার চেয়েও উর্ধ্বে বলিয়অ বিশ্বাস রাখিবে। বাহ্যত বিষয়টি যদিও উল্টা হইয়া পড়িয়াছে যে আমি (পীর হিসাবে) তাহাদের স্থলে আর তাঁহারা (মুরীদ বলিয়া) আমার স্থলে। ইহাদের ংসর্গকে সুবর্ণ-সুযোগ বলিয়া মনে করিবে। এই যুগে এমন গুণবালীর অধিকারী পাওয়াই যায় না। ইহাদের বরকতপূর্ণ খেদমতে যাইয়া ফয়জ হাসিল করিতে সচেষ্ট হইবে। এই পুস্তিটিতে সুলুকের যে বিধি পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে তাঁদের সম্মুখে অর্জন করিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে ইনমাআল্লাহ বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকিবে না। আল্লাহ তা'আলা ইহাদের আয়ুতে বরকত দিন। মারিফতের সকল নেয়ামত এবং স্বীয় স্বলব ও নৈকট্যের মর্যাদায় বিভূষিত করুন। সুইচ্চ মর্যাদায় আসীন করুন। তাঁহাদের হেদায়েতের নূরে সারা পৃথিবী উজ্জ্বল করুন। সরওয়ারে আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সদকায় কিয়ামত পর্যন্ত ইহাদের ফয়জ জারি রাখুন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِاُسْتَاذِنَا وَلِمَشَائِخِنَا وَلِاَحْبَابِنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

মাশায়িখে তরীকত রিযওয়ানুল্লাহি আলায়হিমের সিলসিলাসমূহ

চিশ্‌তীয়া সাবিরিয়া কুদ্দুসিয়া সিলসিলার বর্ণনা

দ্বীনহীন ফকীর খান্দানে বুযুর্গানের লজ্জা, তরীকতের বদনামকারী ইমদাদুল্লাহ (আল্লাহ তাহাকে মাফ করুন) কুতবে দাওরান হযরত মিয়াদী শহা নূর মুহাম্মদ ঝান্‌ঝানাবী (র) হইতে বায়আত ও ইজাজত এবং খিরকা লাভ করিয়াছে, তিনি হাজী শাহ আঃ রহীম শহীদ বেলায়েতী (র) হইতে, তিনি হযরত আঃ বারী (র) হইতে, তিনি শাহ আবদুল হাদী আমরুহী (র) হইতে, তিনি শাহ আজদুদ্দীন (র) হইতে, তিনি শাহ মুহাম্ম ম্ককী (র) হইতে, তিনি শাহ মুহাম্মদী (র) হইতে, তিনি শাহ মুহিরুল্লাহ এলাহাবাদী (র) হইতে, তিনি শাহ আবু সাহিয়দ গঙ্গুহী (র) হইতে, তিনি শায়খ নিজামুদ্দীন বল্‌খী (র) হইতে, তিনি শায়ক জালালউদ্দীন থানেশ্বরী (র) হইতে, তিনি কুতবুল আলম আবদুল কুদ্দুস গঙ্গুহী (র) হইতে, তিনি শায়খ মুহাম্মদ আরিফ রদলভী (র) হইতে, তিনি শায়খ জালালউদ্দীন থানেশ্বরী (র) হইতে, তিনি কুতবুল আলম আবদুল কুদ্দুস গঙ্গুহী (র) হইতে, তিনি শায়খ মুহাম্মদ আরিফ রদলভী (র) হইতে, তিনি শায়ক শরফুদ্দীন তুরক পানিপথী (র) হইতে, তিনি হযরত আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবের (র) হইতে, তিনি শায়খ ফরিদুদ্দীন গঞ্জে শকর মাসউদ আয়ওয়াধানী (র) হইতে, তিনি খাজা কুতুবুদ্দীন গঞ্জে শকর মাসউদ আযওয়াধানী (র) হইতে, তিনি খাজা কুতুবুদ্দীন হাসান বখতিরয়া রকাকী (র) হইতে, তিনি খাজা মুঈনদ্দীন হাসান সান্‌জিরী (র) হইতে, তিনি খাজা উসমান হারুনী (র) হতে, তিনি খাজা হাজী শরীফ জান্দনী (র) হইতে, তিনি খাজা মওদুদ চিশতী (র) হইতে, তিনি খাজা আবু ইউসুফ চিশ্‌তী (র) হইতে, তিনি খাজা আবি আহম্মদ আবদাল চিশ্‌তী (র) হইতে, তিনি খাজা আবূ ইসহাক শামী (র) হইতে, তিনি খাজা মামশাদ ইলুভে দীনীরী (র হইতে, তিনি খাজা আমীনুদ্দীণ আবু হোরায়রা বসরী (র) হইতে, তিনি খাজা হোজায়ফা মারআশী (র) হইতে, তিনি খাজা ইব্রাহীম আদহাম বলখী (র) হইতে, তিনি ইজমালউদ্দীন ফুযায়ল ইবনে আয়াজ (র) হইতে, তিনি খাজা আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ (র) হইতে, তিনি ইমামুল আরিফীন খাজা হাসান বসরী (র) হইতে, তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদুল মুরসালীন খাতামুন্নাবিয়ীন আহম্মদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী আজমায়্যিন হইতে ইজাযত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চিশতীয়া নিযামিয়া কুদ্দুসিয়া সিলসিলা

হযরত আবদুর কুদ্দুছ গঙ্গূহী (র) নিযামিয়া তরীকার ইজাযত পাইয়াছেন শায়খ দরবেশ ইবনে মুহাম্মদ কাছেন আওধী (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদ বুঢ্ডন বাহড়ায়েচী (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদ জালাল উদ্দীন বোখারী (র) মুখদূম জাঁহানিয়ামে জাঁহাগাশত হইতে, তিনি খাজা নাসিরউদ্দিন রওশান চেরাগে দেহলবী (র) হইতে, তিনি সুলতানুল মাশায়েখ মায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া তৎপর এই সিলসলা জনাবে রসুলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত অনুরূপ।

কাদরিয়া কুদ্দসিয়া সিলসিলা

হযরত কুতবুল আলম আবদুল কুদ্দুছ গঙ্গুহী (র) তরীকায়ে কাদরিয়ার ইজাযত লাব কিরয়াছেন হযরত ইবনে মুাহম্মদ কাছেম আওধী (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদ বুঢ্ডন বাহড়ায়েচী (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদ জালাল উদ্দীন বোখারী (র) হইতে, তিনি শায়খ উবায়েদ ইবনে ঈসা (র) হইতে, তিনি শায়খ উবায়েদ ইবেন আবুল কাছেম (র) হইতে, তিনি শায়খ আবুল মাকারেম ফাজেল (র) হইতে, তিনি শায়খ কুতুবুদ্দীন আবুল গায়ছ (র) হইতে, তিনি শায়খ সামসুদ্দীন হাদ্দাম (র) হইতে, তিনি ইমামুল আওলিয়া মায়খ মুহিউদ্দীন আবুদুল কাদের জিলানী (র) হইতে, তিনি ইমামুল আওলিয়া শায়খ মুহিউদ্দীন আবুদল কাদের জিলানী (র) হইতে, তিনি শায়খ আবু সাঈদ মখরুমী (র) হইতে, তিনি শায়খ আবুল হাচান কারশী আলী আল হানকারী (র) হইতে, তিনি শঅয়ক জুনায়েদ বোগদাদী (র) হইতে, তিনি শায়খ হিররী সিক্তি (র) হইতে, তিনি শায়খ মাৎরুফ কারখী (র) হইতে, তিনি শায়খ, দাউদ তায়ী (রঃ) হইতে, তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) হইতে, তিনি হযরত সরওয়ারে আমল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে ইজাযত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অধম কাদরিয়া তরীকার সিলসিলা নিম্ন বর্ণিতভাবেও প্রাপ্ত হইয়াছে। হযরত মিয়াজী নুর মুহাম্মদ ঝানৃজানভী (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদ আবদুল হাই (র) হইতে, তিনি সাইয়েধ্য মুহাম্মদ গাইছ (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদ আবু মুহাম্মদ (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদ শাহ মুহাম্মদ (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদ কামীছুল আমল (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদ ইলয়াস মাগরিবী (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদ আহমদ কুদছী (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদ আবদুল কাদির রাসী (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদ আবদুল ওহ্হাব (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদ ইয়াহ্ইয়া জাদে (র) হইতে, তিনি

সাইয়্যেদ য়নুদ্দিন (র) হইতে, তিনি সাইয়্যেদ আবদুর রাজ্জাক (র) হইতে, তিনি গাওছুচ্ছাকালাইন শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (র) হইতে। বাজী সিলসিলা আঁ হযরত আল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত অনুরূপ।

কুদ্দুসিয়া নকশবন্দিয়া সিলসিলা

হযরত মীরান আজমল বাহড়ায়েচী (র) শাহ আবদুল হক (র) হইতে, তিনি খাজা ওবায়দুল্লা (র) হইতে, তিনি খাজা মাওলানা য়াকুব চরখী (র) হইতে, তিনি খাজা আলাউদ্দীন আতা (র) হইতে, তিনি খাজা আমির কালাল (র) হইতে, তিনি খাজা মুহাম্মদ বাবা ছামাদী (র) হইতে, তিনি খাজা আযিযালে আলি রামেতিনী (র) হইতে, তিনি খাজা মাহমুদ আবুল খায়ের ফাগপুত্তী (র) হইতে, তিনি কাজা মুহাম্মদ আরিফ রিউগিরী (র) হইতে, তিনি খাজা আবদুল খারেক গাজ্‌দুয়ানী (র) হইতে, তিনি খাজা ইউসুফ হামদানী (র) হইতে, তিনি খাজা আবু আলী ফারমুদী (র) হইতে, তিনি খাজা ইমাম আবুল কাছেম কুশাইরী (র) হইতে, তিনি খাজা আবু আলী দাক্কাক (রঃ) হইতে, তিনি খাজা আবুল কাছেম নাছিরাবাদী (র) হইতে, তিনি খাজা আবু বরক শিবলী (র) হইতে, তিনি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র) হইতে, তিনি সায়খ দাউদ তায়ী (র) হইতে, তিনি হাবীব আজমী (র) হইতে তিনি ইমাদুল আউলিয়া হাসান বসরী (র) হইতে, তিনি হযরত আমীরুল মু'মিনীন আলী (র) হইতে, তিনি সরওয়ারে আমল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে ইজাযত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নিম্নবর্ণিত রূপেও অধমের এই তরীকার সিলসিলা রহিয়াছে ঃ

হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ শাহ (র) হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (র) হইতে, তিনি শাহ আবদুল আজীজ (র) হইতে, তিনি শাহ আলী উল্লাহ (র) হইতে, তিনি শাহ আবুর রহীম (র) হইতে, তিনি শাহ আবদুল্লাহ (র) হইতে, তিনি সইয়্যেদ আদম বিন্নেরী (র) হইতে, তিনি ইমামে রব্বানী শায়খ আহমদ মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র) হইতে, তিনি কাজা বাকী বিল্লাহ (র) হইতে তিনি খাজা মকনিগী (র) হইতে, তিনি মাওলানা দরবেশ (র) হইতে, তিনি মাওলানা যাহেদ (র) হইতে, তিনি খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার (র) হইতে, হযরত সরওয়ারে আমল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত বাকী বিলসিলা অনুরূপ।

নিম্নবর্ণিত রূপেও অধমের এই তরীকার সিলসিলা রহিয়াছে ঃ

হযরত নাছির উদ্দীন দেহলভী (র) হইতে, তিনি শাহ মুহাম্মদ আফাক দেহলভী (র) হইতে, তিনি খাজা যিয়াউল্লাহ (র) হইতে, তিনি খাজা মুহাম্মদ জুবায়ের (র) হইতে, তিনি খাজা হজ্জাতুল্লাহ মুহাম্মদ নক্‌শবন্দ ছান (র) হইতে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সিলসিলা অনুরূপ।

সোহ্‌হরাওয়ার্দীয়া কুদ্দুসিয়া সিলসিলা

কুতুবুল আলম আব্দুল কুদ্দুছ গঙ্গুহী (র) সাইয়্যেদ আজমল বাহড়ায়েচী (র) হইতে, তিনি শঅয়খ জালাল উদ্দীন বোখারী (র) হইতে, তিনি শায়খ রুকুনুদ্দীন আবুল ফাতাহ (র) হইতে, তিনি শায়খ সদরউদ্দীন (র) হইতে, তিনি শায়খ বাহাউদ্দীন জাকারিয়া মুলতানী (র) হইতে, তিনি শায়খ শিহাবউদ্দীন সহরওয়ার্দী (রঃ) হইতে, তিনি শায়খ আবু নাজীব সোহরাওয়অর্দী (র) হইতে, তিনি শঅয়খ আজীহুদ্দীণ আব্দুল কাদের সোহরাওয়অর্দী (র) হইতে তিনি শায়খ আবু মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লহা (রঃ) হইতে, তিনি শায়খ আহমদ দীনূরী (রঃ) হইতে, তিনি শায়খ মাম্‌শ উলুতে দীনূরী (র) হইতে, তিনি হযরত জুনায়েদ বাগ্‌দাদী (র) হইতে, তিনি হযরত মা'রুফ কারখী (র) হইতে, হযরত সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আল্‌য়হ ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সিলসিলা অনুরূপ।

কিবরিয়া কুদ্দুসিয়া সিলসিলা

জালাল উদ্দীন বোখারী (র) শায়খ হামীদুদ্দীন সমরকন্দী (র) হইতে, তিনি শামছদ্দীন ইবনে আবু মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) হইতে, তিনি শায়খ আতায়ে খালেদী (র) হইতে, তিনি শঅয়খ আহমদ বাবা কামাল খবান্দী (র) হইতে, তিনি শঅয়খ নজমুদ্দীন কুবরা (র) হইতে, তিনি হযরত আম্মার ইয়াছির (রঃ) হইতে, তিনি হযরত আবু নজীব সহরওয়অর্দী (র) হইতে, তিনি শঅয়খ আহমদ গাজালী (র) হইতে, তিনি আবু বকর নাসসাজ (র) হইতে, তিনি আবুল কাছেম গুরগানী (র) হইতে, তিনি খাজা আবু উসমান মাগ্‌রেবী (র) হইতেম তিনি আবু আলী কাতেব (র) হইতে, তিনি শায়খ আলী রোদবারী (র) হইতে, তিনি হযরত জুনায়েধ বাগদাদী (র) হইতে, সরওয়ারে আমল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত বাকী সিলসিলা উক্ত রূপ।

আউলিয়া হযরত শায়েখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহঃ)-এর বয়ান

নিরাপত্তার বয়ান

বিপদ থেকে মুক্তি যদি চাওগো ভাই।
দুইট জিনিস থেকে দূরে থাকা চাই॥
নফ্স, দুনিয়া হইতে থাক ফিরিয়া।
বিপদ তোমায় লইবেনা আর ঘিরিয়া॥
আশা ও লোখে রও যদি মজ্িয়া।
সব দিক থেকে বিপদ আসবে সাজিয়া॥
টাকা-পয়সা নেই যার থলের ভেতরে।
যথার যাইবে থাকিবে বিনা ডরে॥
মন-বাসনা ছাড়, দুনিয়া ছাড় ভাই।
সব বিপদ থেকে তুমি পাবে রেহাই॥
কত আচে হীণ নফসের লাগিয়া।
বিপদ মাঝে চিন্তায় আছে লাগিয়া॥
নফ্সেরই কারণে বঞ্চিত পাখী।
শিকারীর জালে পড়িয়া পায়ু ফাঁকি॥
তোমার অন্তর এসময় শান্তি পাবে।
যবে বিশ্বের মূল্য দেলে না ররে॥
আল্লার শাস্তি থেকে নির্ভয় হইও না।
কোন মোমেন ভাইকে কষ্ট দি-ও না॥
বিপদে কারো সাহায্য চাইও না।
আল্লাহ ছাড়া কেউ সাহায্য দিবে না॥
কাউকে কষ্ট দিয়া থাকলে ক্ষমা চাও।
হাশরের মাঠে শত্রু হইতে নাদাও।
আল্লাহ পাকের কাছে যে ধনট্য চায়।
অল্পে তুষ্টির মধ্যে তাহা খুঁজে পায়।

আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নে'মাতের বয়ান

চারটি জিনিস আল্লাহর বিশেষ অনুদান।
এই ছবক ধরে যে, সে হয় ভাগ্যবান॥
প্রথমটি উহার সত্যবাদী হওয়া।
তারপর দানশীলতা, হাসি মুখ রওয়া॥
এপর আমানতের হেফাজাত করা।
আর খেয়ানত থেকে নজর পাক করা॥
এই চারটি আল্লাহ্ পাক্ যাকে দিয়েছে।
সেই তো পরহেজগার ও মোমেন হয়েছে॥

শয়তানী কর্ম-কাণ্ডের বয়ান

চারটি অভ্যাস শয়তানী কর্ম হবে।
আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি উহা জানিবে॥
হাঁচি কেহ দেয় যবে তার নামাযে।
হইবে উহা গণ্য শয়তানের কাজে॥
শয়তানের তরফ থেকে রক্ত নাকের।
শয়তান হয় প্রকাশ্য শত্রু মানুষের॥
হাই তোলা, বমি করা তার কামনা।
তাহার ধোকা থেকে নির্ভয় হইও না॥

যে সকল জিনিসের দ্বারা দুনিয়ায় খুশী হওয়া উচিত না তার বয়ান

জগতের শান্তি সব অশান্তি হবে।
এর খুশী পর কালে দুঃখ হবে॥
খুশী হইওনা দুনিয়া তেকে শোন।
ফূর্তির জায়গা এই দুনিয়া নয় -জান॥
ধরার খুশী আল্লাহ্ ভাল বাসে না।
এই কথা ওস্তাদের চবক ভুলবোনা॥
পরকালের চিন্তা অভ্যাস করে লও।
অন্তর মুখ মূল প্রিয়জন পানে ঘুরাও॥
বৈধ হয় আল্লার দানে খুশী হলে।
ভুর হবে ধরার শান্তিতে মাতিলে॥
দুঃখ-কষ্ট আল্লহার বান্দাদের খোরাক।
শান্তি কামীরা হইবে দুঃখের পোষাক॥
চিন্তা কর ছেলে! কি জন্য এলে।
স্বীয় চিন্তা সবাই করে হে ছেলে॥

অত্মীয়তা রক্ষা করার বয়ান

আত্মীয়দের দেখাশুনা করতে যাও।
বয়সের সীমা বাড়বে তব যদি চাও॥
যেই ব্যক্তি আত্মীয়ের থেকে ফিরে রয়।
অবশ্যই তার হায়াত কমিয়া যায়॥
যে কেউ আত্মীয় স্বজন চাড়িয়া দেয়।
স্বীয় দেহ বিচ্ছুদের খোরাক বানায়॥
যদিও দুষ্ট হয় তব আত্মীয়।
ছিন্ন করার মন্দ হয় তার চেয়েও॥
যেই ব্যক্তি আত্মীয় দেয়না পরিচয়।
মন্দ হিসাবে তা রনাম ছাড়ইয়া যায়॥

যে সকল লোক বন্ধুত্বের যোগ্য নয়

তাদের বয়ান

দুষ্ট বন্ধু নিজ উপকার করে না।
তার উপকারের আশা করিও না ॥
প্রকাশ্যে যে তব দোষ গাইয়া ফেরে।
বন্ধু নয় সে, সাথী না বানাও তারে ॥
মদ খোরের সংগে বন্ধুত্ব করিও না ॥
দূরে থাক, তা রকাছেও যাইও না ॥
যাকাত ছেড়ে দেয় যদি কোন ধনী।
আজীবন তার তেকে দূরে রও তুমি ॥
সুদ চাইলে কেউ রইওনা আর তার পাশে।
তার মাতা যদিও তব পায় ঘষে ॥
সুদ খোরদের তেকে দূরে রও সর্বদা।
তাদের শত্রু মহা ইনচাফগার খোদা ॥
লোক-জনের থেকে যে সুদ গ্রহণ করে।
'মারহাবা' বলিওনা কভু তারে ॥

দরবেশীর বয়ান

দরবেশী কি জান তুমি? হে ছেলে!
বলবো তোমায় ইহা কি, না জানিলে ॥
যদিও ফকীর মোটা পোষাকে সে।
সবার কাচে নিজকে ধনী প্রকাশে ॥
ক্ষুধার্ত থাকিয়াও তুষ্টি দেখায়।
শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব সে ঘটায় ॥
যদিও দুর্বল ও অপরাগ সে হয়।
ইবাদাতে সংগীতর চেয়ে কম না রয় ॥
শূন্য হাতেও তাজা রাখে হৃদয়।
দুর্বলতার মধ্যেও শক্তি দেখায় ॥
আল্লাহ ওয়ালার কাছে নিজকে দাও সুপে।
আল্লাহ্ বাচাইবেন তোমায় সুন্দর রূপে ॥
আল্লাহ্ ওয়ালার সান্নিধ্যে যে কেউ রবে।
জান্নাতের মেহমান খানায় খাছ লোক হবে।

পরহেজগার লোকের নিদর্শনের বয়ান

তিনটি চিহ্ন পরহেজগারের মধ্যে হয়।
পরহেজগার, দুর্ভাগার সম্পর্ক কোথায় ॥
হে পরহেজগার! দুই বন্ধু লইও না।
মন্দ কর্মে ফেলতে তোমায় পারবে না ॥
পরহেজগারের মুখে মিথ্যা চলে না।
মিথ্যে পথে নিকটেও ঘেষে না ॥
সন্দেহ হইলে হালালও ধরে না।
যাতে সে হারামের মধ্যে পড়ে না ॥

মুনাফিকের নিদর্শনের বয়ান

বৎস! দূরে থাক মুনাফিক হতে।
জেলখানা তার জান জাহান্নামেতে ॥
তিন চিহ্ন মুনাফিক মাজে প্রকাশ্যে।
ঐ কারণে আল্লার অভিশপ্ত সে ॥
তার অর্গীকার সবই হইবে ভংগ আর।
মিথ্যাও গল্প চাড়া বাক হয় না তাঁর॥
মোমেনদের কে সাহায় করে না সে।
আমানতে খিয়ানত করে বসে ॥
মুনাফিকের অংগীকার পূর্ণ হয় না।
এই কারণে তার মুখে আলো রয় না॥
মুনাফিককে আমানত দার বুঝবেনা।
তার খারাবী নাথাক্ বিশ্বে-কামনা॥
বৎস! মুনাফিক থেকে দূরে সর।
তার হত্যার লাগি তলোয়া তেজ কর ॥
সেই ব্যক্তি মুনাফিকের পাশে ঘেষে।
তার ঠিকানা হয় কুয়ার তলদেশে ॥

অন্তর শক্ত হওয়ার বয়ান

শক্ত দিল্ মানুষের তিনটি চিহ্ন পাই।
দেখলে তার থেকে উহা সরিয়া যাই ॥
দুর্বল লোকের উপর করে অত্যাচার।
কম-বেশী কিছুতে তুষ্টি হয় না তার ॥
যতই উপদেশ বেশী দাও তারে।
পৌঁছেনা উহা তার কঠিন অন্তরে ॥
দুনিয়াদার.কে মরা জান আসলে।
মরার সংগী হইওনা কোন কালে ॥

প্রয়োজনীয় বস্তু চাওয়ার বয়ান

বদ মেজাজ থেকে নিজ দরকার চাইও না।
হাস্য মুখ ব্যক্তি ছাড়া তা কইও না ॥
কোন মোমেন ঠেকিলে কাছে তোমার।
যত পার প্রয়োজন মিটাও তাহার ॥
বাদশাহ্ ছাড়া স্বীয় দরকার চাইও না।
না পাইলে দ্বারওয়ানের কাছে যাইওনা ॥
শত্রুদের মৃত্যুতে খূশী হইও না।
কারো সামনে কাউকে হালকা করিও না ॥

ফাছিকের নিদর্শনের বয়ান

তিনটি অভ্যাস ফাছিক লোকের ভিতরে।
ফেৎনার ভালবাসা হয় তার অন্তরে ॥
তার অভ্যাস-কষ্ট দেওয়া মাখলুকেরে।
নিজকে সরল পথ থেকে রাখে দূর ॥


মদিনা একাডেমী
মদিনা একাডেমী
মদিনা একাডেমী